তোমাকে হারিয়ে

জীবন,

অন্য আট দশটা মেয়ের মতো আমিও তোমাকে নিয়ে সুখের স্বপ্ন দেখতাম। সে স্বপ্ন তুমিই আমাকে দেখিয়েছিলে। কিন্তু সে স্বপ্নগুলোকে কেন তুমি নষ্ট করে দিলে তা জানি না। অতীতের কতো শত স্মৃতি আজ আমাকে তাড়া করে ফেরে। কতো আপন ছিলে তুমি। সুখে-দুঃখে আমরা একে অন্যের অংশীদার ছিলাম। একটি মিনিট তুমি আমাকে না দেখলে কি অস্থির থাকতে। অথচ আজ আমার কাছ থেকে তুমি যোজন যোজন মাইল দূরে।

সামাজিক নিয়মে হয়তো আমাকে একদিন বিয়ের পিড়িতে বসতে হবে। কিন্তু তুমি আমাকে নীরবে বিধবা বানিয়ে গেলে। তোমাকে কোনোদিন ভুলতে পারবো না। তুমি তো জানো জীবন, তোমার জন্য কতো কষ্ট করেছি, কতো শত অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছি। শুধু তোমাকে পাবার জন্য সব কিছু নীরবে সয়ে গেছি। শেষ পর্যন্ত তোমাকে না পাওয়ার আশংকাটাই সত্যি হলো।

তোমার অন্য নাম থাকা সত্ত্বেও জীবন বলে ডাকতাম। সত্যিই তুমি আমার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছিলে। তোমাকে খুব বেশি মনে পড়ছে। আজ হয়তো তোমার কাছ থেকে কোনো ফুল উপহার পাবো না। কিন্তু তোমাকে একটি গোলাপ উৎসর্গ করলাম। তাছাড়া ঠিক আগের মতো আমার ব্যথা ভরা হৃদয়ের ভালোবাসা জানাচ্ছি। তোমাকে হারিয়ে আমার ভাষা আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে। আমার কষ্টের কথাগুলো কাগজ কলমের আচড়ে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। পৃথিবীর সকল ঘৃণা তুমি আমাকে দিয়েছো। তাতে কোনো দুঃখ করিনি। কারণ ভালোবাসার মানুষ যতো কষ্টই দিক না কেন প্রিয়ার কাছে তা কষ্টের মনে হয় না।

আমি যাযাবরের মতো জীবন চাইনি। চেয়েছিলাম তোমার ভালোবাসা বুকে নিয়ে বেচে থাকতে। কিন্তু সব কিছু তুমি মিথ্যা করে দিলে। তিল তিল করে সাজানো ভালোবাসা শুকনো পাতার মতো ঝরে গেল। তোমাকে খুব বেশি ভালোবাসতাম। তার যোগ্য প্রতিদানই তুমি আমাকে দিলে। আমার সাজানো জীবনটা নষ্ট করে তুমি আজ কতোটা সুখী তা আমার জানা নেই।

এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে সব মানুষই কিছু না কিছু চায়। কেউ পায়, কেউ বা চোখের জলে জীবন কাটায়। আমি না হয়, না পাওয়ার দলেই রইলাম। হৃদয়ের নীল আকাশে মুক্ত বিহঙ্গের মতো যে ভালোবাসা ঘুরে বেড়াতো সে আজ নিয়তির কবলে বন্দী। নিজেকে বড় একা মনে হয়। জীবনটা দারুন ভাবে ক্ষতবিক্ষত। আমার পরম আরাধ্য ভালোবাসাকে খুন করে নিজের মতো সাজিয়ে নিয়েছো জীবন। একটিবারের জন্যও আমার কথা ভাবলে না। ভাবতে অবাক লাগে!

আর অবাক হবারই কি আছে! তোমাদের মতো মানুষেরা ভালোবাসার দাম বোঝে না। একটা মানুষ এতো দ্রুত বদলে যেতে পারে তা বিশ্বাস করতে পারি না। আমাকে কাদিয়ে যদি সুখ পাও, সুখে থেকো সারা জীবন। তোমাকে দেয়ার মতো আমার কিছুই বাকি নেই। সব কিছু উজাড় করে দিয়েছি।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

দুঃস্বপ্ন

কোনো এক বিকেলে ভাইবোন ছাড়া একা বেড়াতে যাই ভাবীদের বাড়িতে। আমার সমবয়সী ভাবীর কোনো বোন ছিল না, ছিল দুই ভাই। একজন আমার বয়সী, অন্যজন তিন বছরের বড়।

ভাবীর ভাইদের সঙ্গে আগে থেকে আমার ভালো একটা সম্পর্ক ছিল। তাই ওদের বাসার সবার সঙ্গে আমি খুব ফ্ ছিলাম। ভাবীর বড় ভাইয়ার নাম ছিল আকাশ। তার ছোট দুটি চোখে কি যে নেশা ছিল তা নিজেও বুঝে উঠতে পারিনি। আমার সঙ্গে আকাশভাই আগে বোনের মতো আচরণ করলেও এবার তার আচরণে কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ্য করলাম। মাঝে মধ্যে কেমন আনমনা হয়ে আমার দিকে একটানা চেয়ে থাকতেন। ওনার চোখের দিকে তাকালে মনে হতো তিনি আমার ভেতরকার সব কিছু একবারে ভ্রমণ করে আসছেন। লজ্জায় ভাইয়ার সামনে থেকে চলে যেতে বাধ্য হতাম।

একদিন আকাশভাইয়া বেড়াতে নিয়ে গেলেন সমুদ্র সৈকতে। তখন প্রায় চারটা। সমুদ্রের কাছে গিয়ে ভাইয়া এতো বেশি আবেগ প্রবণ হয়ে গেলেন যে, গানের ভুবনে ডুবে রইলেন সারাটি ক্ষণ।

এরই মাঝে ভাইয়া আমার হাত ধরতে চেয়েছেন।

প্রথমে না দিলেও পরে দিয়েছি। কেন দিয়েছি তা জানি না।

কখন যে সন্ধ্যা পার হয়ে রাত আটটা বেজে গেছে, কারোই জানা হলো না।

নিতে না চাইলেও সেখানকার একটা দোকান থেকে একটা গলার মালা কিনে দিয়েছেন আমাকে।

বাসায় ফিরতে দেরি হওয়ায় খালা-খালু বকা দিয়েছেন।

কিছুদিনের মধ্যে ভাইয়ার এতো কাছে চলে এসেছি যে, ধীরে ধীরে তার কথার জালে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে লাগলাম।

একদিন ভরদুপুরে ভাইয়া অফার করলেন সমুদ্র পাড় থেকে বেড়িয়ে আসার।

কেন জানি চট করেই রাজি হয়ে গেলাম। ঘরে পরা সাধারণ কাপড় পড়েই চলে গেলাম তার সঙ্গে।

হাটতে হাটতে একটা গাছের নিচে বসে পড়লেন ভাইয়া।

আমিও বসলাম তার পাশে।

তখন তিনি আমার হাত দুটো খুব জোরে ধরে বললেন, তুমি আমাকে আর ভাইয়া ডাকবে না, ডাকবে শুধু আকাশ। আমিও তোমাকে নীলা বলেই ডাকবো।

বললাম, পারবো না।

কেন পারবে না? চেষ্টা করো, পারবে।

অনেক চেষ্টা করে শুধু একবার তাকে আকাশ বলে ডেকেছি।

এতেই সে এতো খুশি হয়ে আমাকে তার বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরলো, লজ্জা, ভয়ে তার কাছ থেকে সরে এসেছি। দৌড়ে গিয়ে সমুদ্রের পানি ছুয়ে দেখতে চেয়েছি এটা কি সত্যি ছিল, নাকি আমার মনের ভুল?

পরে ধীরে ধীরে আকাশের কাছে এসে গাছ ধরে দাড়িয়ে থাকি।

সে আমার ওড়না ধরে টেনে আমাকে বসাতে চেয়েছিল। কিন্তু পুরো ওড়নাটা তার হাতে চলে যায়।

তখন আরো লজ্জায় তার হাত থেকে ওড়নাটা নিয়ে জড়িয়ে নিই নিজের গায়ে। সে তার পাশে বসতে বললে কিছু না ভেবেই বসে পড়ি।

সে তখন জিজ্ঞাসা করলো, কেন তার কাছ থেকে এভাবে ছুটে চলে গেছি।

কোনো উত্তর দেইনি তার প্রশ্নের।

সে আমার চোখে লজ্জার যে সুন্দর রূপ তা দেখতে পেল। এবার তার সাহস আরো বেড়ে গেল। সে আমাকে তার মুখোমুখি বসতে বললো।

বসলাম।

সে প্রথমে আমার হাত ধরলো। ফিশফিশ করে কানের কাছে কি যেন বলতে এসে আমাকে পুরোপুরি তার বাহুতে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে রাখলো, কোনো ভাবেই ছাড়িয়ে আসতে পারলাম না।

তখন তার দুচোখে ক্রেইজি একটা ভাব দেখতে পেলাম। দীর্ঘ পাচ মিনিট তার বাহুতে আটকা থাকলাম। এরই মাঝে সে সাহস করে আমার মুখে দুই একটা কিসও বসিয়ে দিল।

কি ভীষণ ভালো লাগায় আমিও ডুবে গলাম তা নিজেও জানতে পারলাম না।

এরপর বাসায় ফিরে তার দিকে তাকাতে আমার খুব লজ্জা হচ্ছিল।

এর একদিন পরে সে আবার আমাকে খোলা এক প্রান্তরে যাবার অনুরোধ করলো।

মনে হয় ভালো লাগার টানে তার সঙ্গে সেখানে গেলাম। দুজনে বসে বসে কথা বলছি, পাশে বয়ে গেছে এক নদী। কথা বলার ফাকে ফাকে বাদাম আর পানীয় খেলাম।

কথা বলতে বলতে প্রায় সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেল। ওই জায়গা থেকে ফেরার মতো কোনো রিকশা পাওয়া যাচ্ছে না। পরে অনেক কষ্টে একটা রিকশা পাওয়া গেল। রাস্তা বেশ একটা ভালো না থাকায় দুজনাতে খুব ধাক্কা লাগছিল। এর মাঝে তার একটা হাত আমার কোমরে এসে লাগলো। কিছুটা সুড়সুড়ি এলেও ভালো লাগছিলো।

অন্ধকার রাস্তায় সে আমাকে রিকশার মাঝে জড়িয়ে ধরে মুখে কিস করতে লাগলো। শেষে আমার বুকের ঠিক মাঝখানে সে খুব জোরে একটা কিস করলো যার দাগ অনেক দিন পর্যন্ত ছিল।

বাসায় ফিরে সিড়ি দিয়ে ওঠার সময় সে আবার আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

কোনোমতে ছুটে বাসায় ঢুকি।

ভাবী আমার কাপড় ছাদ থেকে না নিয়ে আসায় ছাদে গিয়েছি কাপড় আনতে। তখন প্রায় রাত আটটা।

ভয়ে ছাদে না গিয়ে ফিরে আসছি দেখে সে বললো, চলো, আমিও যাচ্ছি, ভয় পাবার কিছু নেই। কাপড় নিয়ে সিড়ি ধরে আসতে সে আবার জড়িয়ে ধরলো।

বাসার কেউ দেখে ফেলার ভয়ে তাকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলাম।

এর একদিন পর ভাবীদের বাসা থেকে নিজ বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সবাইকে বিদায় জানিয়ে আবার তার সঙ্গেই বাসায় ফিরছি। কেউ তখনো জানতো না আমাদের দুজনের মাঝে এমন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ট্যাকসি ক্যাব নিয়ে বাসায় ফিরছি। তখন তাকে জানিয়ে দিলাম, নিজ বাসায় সবার সামনে আপনার সঙ্গে এতোটা ফৃ হতে পারবো না। এর জন্য আগে থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

সে খুব অল্পতেই বুঝে নিয়েছে কি বোঝাতে চেয়েছি। ট্যাকসি ক্যাব–এ সে প্রথম এবং শেষবারের মতো আমাকে পেছন থেকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলো, আমার দেহের উচু স্থানটি তার হাতের মধ্যে চলে গেল।

নিস্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমি তো তার কাছে এমনটি চাইনি। তবে সে কেন এমন করলো।

বাসায় আসার পর থেকে আমার মনে হতে লাগলো, তার সঙ্গে কাটিয়ে আসা সেই সাতটি দিন আমার জীবনে কেবলই একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ সম্পর্ক দুই পরিবারের কেউ মেনে নেবে না।

এখন আমার কেবলই মনে হয়, কেন যে গেলাম বেড়াতে আকাশদের বাড়ি! না গেলেই বোধহয় ভালো হতো।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, চট্টগ্রাম থেকে

আংটি বদল

– এম দুলাল

ছোট বোনের বিয়ে। বাড়ি ভর্তি অতিথি। আমার দুলাভাই আছে শ্যালিকাদের নিয়ে ব্যস্ত। তাকে কাজের সময় খুজে পাওয়া যায় না। একবার কি কারণে যেন তাকে খুজছিলাম। আপাই আমাকে ডেকে পাঠালেন। খুজতে খুজতে গিয়ে দেখি আমার এক ভাবীর ঘরে চাচাতো বোনদের নিয়ে আড্ডায় মেতে আছে।

আমিও গিয়ে ফেসে গেলাম। ভাবী আমাকে ছাড়লেন না। সবার মধ্যমণি করে দিলেন আমাকে।

রাত তখন সাড়ে নয়টা। বিয়ে বাড়ির কাজকর্ম প্রায় শিথিল। পরের দিন অনুষ্ঠান। আমি ভালো গান গাই, সবাই জানতো। কিন্তু আমি যে প্রকৃতপক্ষে বাথরুম সিঙ্গার এটা কেউ জানতো না। আমার একটি হারমোনিয়াম আছে এটাই আমার ট্রেড মার্ক। গল্প গুজব চলছে, কৌতুক চলছে, মাঝে মধ্যে ভাবী এটাওটা খেতে দিচ্ছেন, এভাবেই চললো কিছুক্ষণ। আসরের অধিকাংশ সদস্য ঢাকা প্রত্যাগত আর সে কারণেই এতো আনন্দ।

হঠাৎ দুলাভাইয়ের কণ্ঠে গান, *ওরে পান্না, যৌবন তোর টলোমলো কচুপাতার পানি ...*।

হাসতে লাগলো সবাই। যাকে উদ্দেশ্য করে গানটা গাওয়া হলো তার নাম আন্না। তবে তাকে যখন ডাকা হয়, শব্দটা আন্না না পান্না বুঝতে অসুবিধা হয়। তাই অনেকেই পান্না ডাকে।

সে তখন পাশেই দাড়ানো। সম্পর্কে আমাদের প্যাচাল আত্মীয়া। গানের মর্ম শুনে লজ্জা পেল কিন্তু সে পালায়নি।

তৎক্ষণাৎ এই গানটি নিয়ে আমার একটি জোকস মনে হলো। প্যারোডি আকারের একদিন গানটি আমার এক বন্ধুর কণ্ঠে শুনেছিলাম। তাই অবিকল আমিও সুধালাম, *ওরে পান্না ..., যৌবন তোর কুত্তায় খাইলো আমারে দিলি না রে ..., আমার মতো সুজন পাগল কোথাও পাবি না, আমার কাছে ধরা দিয়ে ইজ্জত যাবেগা ...।*

গেটে খিল ধরা হাসি শুরু হলো।

ভাবী এসে আমার পিঠের ওপর ধপাস ধপাস মেরে দিল কটা।

কিছুক্ষণ পর আপার ডাক শুনে চলে গেলাম।

কিন্তু ব্যস্ততার মাঝে আন্নাকে প্রায়ই আমার আশপাশে ঘুরঘুর করতে দেখি। আমি কিছুই মনে করিনি। হঠাৎ আমাদের আত্মীয় স্বজনের মাঝে একটা গুঞ্জন শুনতে পেলাম। আগত অতিথিদের অনেকেই তাকে ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগলো।

এমন সময় আমার এক নানি আমাকে ডেকে বললেন, আন্নাকে তোর পছন্দ হয়?

কেন? পছন্দ অপছন্দের কি আছে? বললাম।

আন্নার সঙ্গে তোর বিয়ের কথা চলছে।

শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। আমার বিয়ে আমি জানি না, অথচ তাকে নিয়ে এতোকিছু হয়ে যাচ্ছে! বুঝতে পারলাম দুলাভাই কেন গান গাইলেন? আমার প্যারোডি শুনে সে কেন আমার কাছেই দাড়িয়ে উপভোগ করলো এবং কেন আমার আশপাশে ঘুরঘুর করছিল?

নানির কথা শুনে তার দিকে এক নজর তাকালাম। কিন্তু তার মুখটা দেখতে পাইনি। কারণ সে এতো কালো যে, অন্ধকারে সহজে মিশে গেছেন।

ঘটনা বেগতিক দেখে তার সঙ্গে একান্তে দেখা করলাম। সে এক ঘণ্টা ধরে বিগত দিনে দুই পরিবারের মাঝে কি কি ঘটে চলেছে সব খুলে বললো।

এ বিয়ের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন আমার দাদা। মেয়ের বাবা গ্রামের মাতব্বর, ধনীও বলা চলে।

আন্না আমাকে বহুদিন থেকেই ভালোবাসে বলে জানালো।

কিন্তু তাকে ওভাবে কখনো দেখিনি এবং আমার নেগেটিভ মতামত জানিয়ে দিলাম।

সে মানতে চাইলো না। কারণ তারা পারিবারিকভাবে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এখন শুধু সময় ও সুযোগের ব্যাপার।

হঠাৎ আমার মাথায় একটি দুষ্ট বুদ্ধি এলো। আমি তাকে বললাম, তুমি যে আমাকে ভালোবাসো কি করে বুঝবো?

কি প্রমাণ চান আপনি? সে বললো।

পারলে একটা কিস করে দেখাও তো। বললাম।

দেরি হলো না। সত্যি সত্যিই আমাকে কিস করতে শুরু করলো।

মাথায় বিদ্যুৎ বয়ে গেল আমার। দুই হাত দিয়ে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু সে আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

আমিও তিন চারটা কিস মেরে শান্ত করে সরিয়ে দিলাম। খুব মাজা লাগলো। মেয়েদের চুমুতে এতো ইউনিক টেস্ট জানতাম না।

পরিশেষে আবার বোঝালাম যে, যতোটুকু হয়েছে, এখানে থাক। আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়।

প্রথমে মন খারাপ করলো। তারপর মেনে নিল এবং বললো যে, মুরব্বিদের মনোভাব বলতে পারি না। কোথাকার পানি কোথায় যায়। তবুও জেনে রাখুন, আমার সারা শরীরে কালো স্পট আছে এবং আমার মেয়েলি রোগসহ অনেক রোগে রোগাক্রান্ত আমি। সুতরাং বিয়ে হলে গেলে পরে যেন প্রশ্ন না ওঠে।

অনুষ্ঠান শেষে চলে আসবো ঢাকায়। বাসস্ট্যান্ডের দিকে গেলাম। গিয়ে দেখি টেইলারিং শপে একটি মেয়ের শুধু দাত দেখা যাচ্ছে। তেমন একটা চেনার চেষ্টা করিনি।

হঠাৎ কে যেন সালাম দিল।

তাকিয়ে দেখি আন্না। কলেজে যাচ্ছে। লাল রঙের লেহেঙ্গা পরা। ড্রেসটা তাকে মোটেও মানায়নি। তাছাড়া বিয়ের কথা শোনার পর থেকে কেন জানি তাকে আরো বেশি বেমানান অনুভব হলো।

বাস এসে থামলো।

আমার সঙ্গে একই বাসে উঠলো এবং একই সিটে পাশাপাশি বসলো।

আট কিলোমিটার পরে তার কলেজ স্টেশন। সে বিবাহিত বৌয়ের মতো আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তাকিয়ে দেখি তার বুক থেকে ওড়না সরে গেছে। রেডিমেড কেনা লেহেঙ্গা বেশ লুজ, ফিট হয়নি। ইচ্ছাকৃত কি না জানি না। তবে উপর থেকে তার স্তন দেখা যাচ্ছিল। তার ওড়না টেনে ঢেকে দিলাম এবং বললাম, রূপ নেই তাতে কি, গুণটা অন্তত প্রয়োগ করো।

মুখে হাত দিয়ে লাজুক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। দেখি তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে বাদামি আকার ধারণ করেছে এবং নাগিনীর মতো ফোস ফোস করছে। মনে হয় বাসে না হয়ে যদি অন্য কোথাও হতো তাহলে সে বোধহয় আমাকে কুপোকাত করে ফেলতো।

আমি ভ্রূক্ষেপ করিনি।

তার নামার সময় হলো। যাওয়ার সময় শুধু এতোটুকুই বললো যে, বিয়ে হোক বা না হোক, আপনাকে কখনোই ভুলবো না। তবে একটা অনুরোধ, কমপক্ষে আত্মীয়তার সূত্র ধরে হলেও আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন।

মাথা নাড়ালাম।

সে হাত বাড়িয়ে বললো, এই নিন, এটাই আমার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। বলে সুড় সুড় করে নেমে গেল।

হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি একটি আংটি। দাড়িয়ে গেলাম। ততোক্ষণে সে হারিয়ে গেল। আর ফেরত দিতে পারিনি।

বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি যে, এ আংটিই আমার যম হয়ে দাড়াবে এবং তাই-ই হয়েছিল। জবাবদিহি করেও কাউকে বিশ্বাস করাতে পারিনি যে, তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

আংটির রেশ ধরে একদিন আমার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। বহু চেষ্টা করেও রোধ করতে পারিনি। তারপর নিজে নিজেই বুদ্ধি বের করলাম যে, প্রথমে আংটি ফেরত দিয়ে পরে মৌচাকে ঢিল মেরে দে ছুট। তাই-ই করলাম।

ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে, আংটি ছিল একটি বাহানা এবং ষড়যন্ত্রের পূর্ব পদক্ষেপ। তাই কৌশলে আমিও আংটিটি চাচাতো বোনের মাধ্যমে ফেরত দিয়ে বললাম, আন্নাকে বলো, বাসর রাতে আংটি বদল হবে। তাই ফেরত দিলাম।

দিতে দেরি হলেও ঢাকার বাস ধরতে দেরি হয়নি। কিন্তু গোয়েন্দা লাগিয়ে দিলাম গ্রামে। ওরাই মেয়ের বাবার মনে প্যাচ মেরে দিল। ব্যস, নির্দিষ্ট সময়ের এক সপ্তাহ আগেই বিয়ে ভেঙে খান খান হয়ে গেল। কেউ টেরই পেল না যে, কি থেকে কি হলো।

দীর্ঘ দিন পার হয়ে গেল। কিন্তু সেই ইউনিক টেস্ট আজো ভুলতে পারিনি। হয়তো দ্বিতীয়বার ছাপ পড়লে তা অস্পষ্ট হবে।

সউদি আরব থেকে
kal_dulal10404@yahoo.com

প্রশ্ন

– শারমিন আক্তার সোহেলী

ওর সঙ্গে আমার পরিচয় যখন আমরা ক্লাস সেভেন–এ পড়ি তখন থেকে। ও অন্য কেউ নয়, আমার বান্ধবী লতিফা। বন্ধু হিসেবে এক কথায় পারফেক্ট। মূল গল্পে আসার আগে কিছু কথা বলে নেয়া দরকার।

লতিফা ছিল তুলনামূলক ভাবে খাটো। গায়ের রঙ চাপা শ্যামলা আবার কালোও বলা যায়। তার চুল ছিল প্রায় হাটুর সমান। সব মিলিয়ে তার চেহারা ছিল বেশ মিষ্টি।

তাদের ছিল যৌথ পরিবার। লতিফার দাদি আমাকে খুব আদর করতেন।

লতিফা পড়াশোনার ক্ষেত্রে খুব ভালো না হলেও প্রথম দিকের একজন ছিল। আমরা একই স্যারের বাসায় প্রাইভেট এবং স্কুলে একই বেঞ্চে বসতাম। তার বাড়ি ছিল গ্রামে। স্যারের বাসায় আসার সময় সে আসতো তার আব্বার বাইসাইকেলে। স্কুল থেকে ফেরার পথে কিছু পথ রিকশা, তারপর নৌকায় নদী পার এরপর পায়ে হেটে বাসায় পৌছাতো।

যখন আমরা ক্লাস এইটে তখন আমরা গল্প করতাম আমরা সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করবো এবং মেহেরপুরের বাইরে গিয়ে পড়শোনা করবো। কেন জানি না, আমি সায়েন্স নিয়ে এসএসসি এবং এইচএসসি পাস করলেও লতিফা আর্টস থেকে পড়শোনা করে এবং ভালো রেজাল্ট করে।

এইচএসসি টেস্ট পরীক্ষার আগে দেখতে এসে হঠাৎ আমার বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তোলার আগে লতিফাদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

তখন লতিফার দাদি এসে বলেন, দেখ তো এই কটা চামড়ার মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেল, আমার নাতনির যে কি করে বিয়ে হবে, কালো মেয়ে কি যে করবো! দেখ তো বোন কোনো ছেলেটেলে পাস কি না? একে নিয়েই যতো চিন্তা।

দাদি চলে যাবার পর লতিফা বলে, দেখেছিস, দাদি কেমন করে বলেন। শুধু তোদের সামনেই না, সবার সামনেই এমন করে বলেন, মনে হয় যেন আমি তাদের বোঝা।

টেস্ট পরীক্ষা শেষে আমার স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় থাকা শুরু করি। পরীক্ষা দেয়ার জন্য মেহেরপুরে গিয়ে পরীক্ষা শেষে তাড়াতাড়ি চলে আসতে হয়। কারণ এদিকে আবার কোচিংয়ের ক্লাস শুরু হয়ে যাচ্ছিল।

আমি তো ঢাকাতেই চেষ্টা করছিলাম। কিছু বান্ধবী চিটাগাং, রাজশাহী এবং কিছু বান্ধবী কুষ্টিয়া ও মেহেরপুরে অনার্সের জন্য ফর্ম সংগ্রহ করে এবং পরীক্ষা দেয়।

পরীক্ষা শেষে আমরা তখন সবাই মেহেরপুরে। বান্ধবীদের গেট টুগেদার–এ লতিফাও আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিল। লতিফা মেহেরপুরের বাইরে পরীক্ষা দেয়া তো দূরের কথা, মেহেরপুর সরকারি কলেজে অনার্সের জন্য ফর্ম পর্যন্ত তোলেনি। সে আমাদের বলে, মেহেরপুর মহিলা কলেজে সে ডিগ্রিতে ভর্তি হবে।

শুনে তো অবাক!

কারণ জানতে চাইলে, প্রথমে আপত্তি জানালেও পরে সব খুলে বলে। তার এইচএসসি পরীক্ষার আগেই তার আব্বা জানান যে, তার বাইরে অ্যাডমিশন নেয়া হবে না।

তখন লতিফা বলে, আমি যদি ভালো রেজাল্ট করি তখনো কি আমাকে বাইরে পড়তে দেবেন না?

তার আব্বাই জানান, আগে রেজাল্ট হোক পরে দেখা যাক কি করা যায়।

লতিফা আর্টসে থেকে A-পেয়ে পাস করে।

এবার কোচিং করার পালা।

উত্তর আসে কোচিং করা যাবে না, বাসায় পড়াশোনা করো।

লতিফা বাসায় পড়শোনা শুরু করে।

এবার আসে ফর্ম তোলার পালা। তখন বাড়ির সবাই জানায় বাইরে পড়াশোনা করা যাবে না, তাকে মেহেরপুর কলেজেই পড়তে হবে।

তাই সে রাগ করে মেহেরপুর সরকারি কলেজে অনার্সের জন্য ফর্ম তোলেনি এবং ডিগ্রি পড়বে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কথা বলতে বলতে সেদিন তার চোখে পানি, তা খেয়াল করেছিলাম। কিছুদিন পরে আবার ঢাকায় ফিরে আসি এবং ক্লাস শুরু করি। মাঝে ছুটিতে কিছুদিনের জন্য মেহেরপুরে বেড়াতে যাই। পৌছাই দুপুরে।

বিকেলের দিকে বিলকিস এসে বলে, চল গোভীপুর যাই। লতিফার হঠাৎ বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ওর বর এসেছে, দেখে আসি।

তখনই রওনা হলাম।

ওর বরের সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে লতিফাকে যে দেখেতে পেরেছি তাতেই আমি খুশি।

অনেক হাসি–ঠাট্টা শেষে এক সময় লতিফার দাদি এসে হাজির আমাদের রুমে।

প্রশ্ন করলাম, কি দাদি, এবার খুশি তো। দাদির চোখে মুখে খুশির ঝলক। নাতজামাই তার খুব পছন্দ হয়েছে।

লতিফা বলে, মাথা থেকে বোঝা নেমেছে তোমাদের। তারপর আবারও সে ইমোশনাল হয়ে পড়ে। সে আমাকে প্রশ্ন করে, বল তো আমার কি আর পড়শোনা করা হবে?

তাকে বলি, কেন হবে না? বিয়ের পর আমার কি পড়াশোনা হচ্ছে না।

তারপর আমাকে বলা শুরু করে। ছোটবেলা থেকে আমার বাবা মা–সহ কেউ আমাকে পড়তে বসতে বলেননি। আমি গরমের ভেতরে হারিকেন জ্বালিয়ে পড়েছি। কোনো বিষয়ে কখনো আমার মতামত

নেয়া হয়নি। এমনকি বিয়ের সময়ও একবার জিজ্ঞাসা করলো না বিয়েতে আমার মত আছে কি না। আমার বাবা মা আমাকে কখনো বুঝতে চেষ্টা করেননি। পরের ছেলে কি আমাকে বুঝবে সোহেলী?

কিছুটা হালকা হওয়ার জন্য ওই দিনের রাতটা আমাদের সঙ্গে আমাদের বাসায় থাকার জন্য আসতে চেয়েছিল। কিন্তু তাকে আসতে দেয়নি। কারণ নতুন বিয়ে হয়েছে, এখন বাইরে বেশি যাওয়া-আসা করতে নেই। গ্রামের লোকে খারাপ বলবে।

গ্রামেই তার খালা শাশুড়ি বাড়ি। যে কেউ যখন-তখন লতিফাকে দেখতে আসতে পারে।

এখনো গ্রামে সেই আগের যুগের প্রচলন রয়ে গেছে। মেয়েদের বেশি শিক্ষিত করে কি হবে! কেন যে এমন আছে জানি না। তবে যার যতোটুকু ক্ষতি হবার তা তো হচ্ছেই, এতে কি কারও মাথা ব্যথা আছে।

জানি না ওর আর পড়াশোনা হবে কি না। তবে আমার যখনই ওর কথা মনে পড়ে তখনই মন থেকে দোয়া বের হয়ে আসে। এর বেশি আমারও কিছু করার নেই। কারণ আমিও একটা মেয়ে। মেয়েদের কিছু বিধি নিষেধের মধ্যে থাকতে হয়।

কমলাপুর, ঢাকা থেকে

ব্যতিক্রমী

ভালোবাসা মানুষকে গতি দেয়, দেয় অফুরন্ত প্রাণশক্তি। জাগায় বেচে থাকার আশা। তাই আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে যখন একেবারে মুষড়ে পড়ি তখন পারিবারিক সদস্যদের অসীম মমতায় মাখানো বোঝাবুঝির পর বিয়ের সিদ্ধান্ত নিই। হয়তো স্ত্রীর সান্নিধ্য এবং অপার নির্ভেজাল ভালোবাসায় পরিপূর্ণ জীবন হবে আমার।

আজ সাত বছর অতিবাহিত হতে চললো আমাদের দাম্পত্য জীবন। দুই বছরের সুন্দর ফুটফুটে সন্তান আমাদের সংসারে। দাম্পত্য জীবনের শুরুতেই নিজেই স্ত্রীকে ভালোবাসা দিতে থাকলাম। যায়যায়দিনের সব কয়টি *ভালোবাসা* সংখ্যা, ফুল আর চকলেটসহ প্রতি বছর ভ্যালেন্টাইন দিবসে দিয়ে ভালোবাসা জানাতাম। স্ত্রীর জন্মদিন, বিয়েবার্ষিকী ইত্যাদিতে নতুন নতুন চমক রাখতাম তার জন্য। শুধু তাকে বোঝানোর জন্য ভালোবাসা কি এবং কিভাবে ভালোবাসার প্রত্যুত্তরে ভালোবাসা জানাতে হয়।

কিন্তু নির্মম সত্য হলো, আমার স্ত্রী এসব বোঝে না। সে বোঝে তার অবাধ চলাফেরার স্বাধীনতা এবং তার আত্মীয়স্বজন। এমনকি আত্মীয়স্বজনের স্বার্থে নিজের সবচেয়ে কাছের মানুষ তার স্বামীকেও কথা, কাজে কিংবা আচরণে আহত করতে দ্বিধা করে না।

মাস্টার্স পাস করা একজন শিক্ষিতা মেয়ে সংসার এবং দাম্পত্য জীবনের সুখ কি তা বোঝে না এ কথা মনে হলে আরো কষ্ট পাই। সারা দিন চাকরিতে অমানুষিক খাটুনি করে সংসারে ফিরে আসি শান্তির আশায়। কিন্তু ঘরে যদি সুখ না থাকে তাহলে জীবনে কি থাকলো! সব সহ্য করে যাই ছোট ছেলেটির মুখের দিকে চেয়ে।

আমার শাশুড়িকে জানিয়েছি। কোনো প্রতিকার পাইনি।

সচরাচর দেখা যায়, মেয়েরা সংসারের শান্তির জন্য সহ্য করে স্বামীর অত্যাচার।

এই ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে সংসারে শান্তির জন্য পুরুষকে সহ্য করতে হচ্ছে স্ত্রীর অত্যাচার।

মগবাজার, ঢাকা থেকে

DV-2005

চেষ্টা করলে এ জগতে অনেক কিছুই অর্জন করা সম্ভব। আমার চেহারা না হয় একটু খারাপ। কিন্তু মনটা তো আর খারাপ নয়!

ছাত্র জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়ে হলো প্রেম। আর এই আধুনিক যুগের ছাত্র হয়ে যদি অন্তত একটি মাত্র প্রেমও না যোগাতে পারি তাহলে বুড়ো বয়সে আমার আলট্রা মডার্ন নাতি–নাতনিরা যখন গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করবে দাদু–নানু, ছাত্র জীবনে তোমার কতোজন গার্লফ্রেন্ড ছিল বা তুমি নানিমার সঙ্গে কতো বছর প্রেম করে বিয়ে করেছো ইত্যাদি।

তখন যদি বলি, না গো দাদু–নানু আমার ছাত্র জীবনে একটি প্রেমও করিনি তখন নিশ্চয়ই নাতি–নাতনিরা আমাকে ব্যাকডেটেড ছাড়া অন্য কিছুই ভাববে না।

স্কুল লাইফের দীর্ঘ সময় শেষ করে এইচএসসি পাসটাও শেষ করলাম। সামনে আছে শুধু অনার্স–এর কয়েকটি বছর। অনার্সে নতুন নতুন মেয়েরা ভর্তি হচ্ছে! এই চান্সে যদি একটা প্রেম করতে না পারি তাহলে প্রেমের বয়সটা পার হয়ে যাবে উপোস থেকেই।

প্রেমের জন্য একটু আধটু মন কাদে না এমন লোক এ ধরাতে আল্লাহপাক সৃষ্টি করেনি। অবশ্য আমার মনটা বুঝি একটু বেশিই কাদে। যার যা নেই শুধু সেই বোঝে না পাবার বেদনা। কথাগুলো গভীরভাবে চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত নিলাম, এবার একটা প্রেম আমাকে করতেই হবে।

ভর্তির আনুষঙ্গিক কাজের ফাকে খুজতাম অনার্সে ভর্তি হতে আসা মেয়েদের মাঝে পাই কি না আমার মনের মানুষটিকে। না, বেশি দেরি করতে হলো না। প্রথম দর্শনেই ভালো লেগে গেল মেয়েটিকে। মাঝারি উচ্চতার সুন্দর ফিগার। হাড়িতে ভাসা রসগোল্লার মতো দুইটি চোখ। কমলার কোষের মতো দুইটি ঠোট ফেড়ে যখন হাসি ঝরে তখন কালবৈশাখির ঝড় বয়ে যায় আমার মনে।

ওর সব সুন্দরের মাঝে যে জিনিসটি আমার সবচেয়ে ভালো লাগতো তা হলো, ওর মায়াভরা মুখখানা। আর কালোর প্রতি দুর্বলতা আমার সব সময়।

আমার বন্ধুরা আজো আমাকে ক্ষেপায়।

কিন্তু আমি জানি, ও আমার ব্ল্যাক ডায়মন্ড। কালোর যে সৌন্দর্য আমার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাই তা হয়তো অনেকেই দেখতে পায় না।

অবশ্য রাগ করি না কখনোই। সুযোগ পেলেই ওর ডিপার্টমেন্টে গিয়ে আমার কালো রানীকে দেখতাম অপলক নয়নে।

এক সময় ওর নাম জানতে পারলাম। ওর নাম নীপা।

এক এক করে এক সময় ওর কানে পৌছে গেল আমার ভালো লাগার কথা। তখনি শুরু হলো চুম্বকের সমমেরুর বিকর্ষণ।

আমি রুমে গেলে ও যায় বারান্দায়। আমি বারান্দার এপাশ দিয়ে গেলে ও যায় ওপাশ দিয়ে। এভাবেই চলতে লাগলো আমার ভালোবাসার গাড়ি।

একবার ঈদে অবশ্য ওর বাসায় গিয়েছিলাম। আমার জীবনে এটিই বুঝি সবচেয়ে সুন্দর ঈদ ছিল। যদিও সঙ্গে কষ্ট ছিল অনেক।

আমাকে নীপা এড়িয়ে চলতো। তাই কখনো ওকে সরাসরি কিছু বলিনি। কেননা এখন আর ছোট নেই, তাই শুধু দূর থেকে দেখতাম। আমি নীরব প্রেমেই বেশি বিশ্বাসী। আমি একজন ছাত্র, কোনো যোগ্যতা নেই ওকে ধরে রাখার ফলে কোন শক্তি নিয়ে যাবো আমার প্রেমের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে!

এভাবেই কষ্টের বোঝা বইতে বইতে এক সময় অনার্স, মাস্টার্স শেষ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে একে একে পার হয়ে গেল সাতটি বছর।

এখন চাকরি খুজছি। আল্লাহ দিলে একটা ব্যবস্থা হবেই। অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম ওর কাছে গিয়ে আমার ভালোবাসার কথা জানাবো। প্রয়োজনে পা ধরে প্রেম ভিক্ষা চাইবো। মানুষ তো, একটু মন গলবেই।

অনেক দিন ওকে দেখি না। তাই ওর এক বান্ধবীর বাসায় গেলাম। গিয়ে শুনলাম নীপা DV-2005 লটারি বিজয়ী হয়েছে।

মুহূর্তেই একটু করে জমে ওঠা আমার কষ্টের পাহাড়টা ধসে নিয়ে কষ্টের সাগরে পরিণত হলো।

আমি মানুষের জন্য কিছু করতে ভালোবাসি। কিন্তু অন্যের কাছে থেকে কিছু পেতে চাই না কখনোই। তাই আজ যদি আমার ভালোবাসার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যাই তাহলে সবাই ভাববে নীপা DV পেয়েছে বলে ওকে পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছি।

আমার ব্যক্তিত্বের কাছে খুব সহজেই আমার চাওয়া পাওয়াকে বিসর্জন দিয়ে দিলাম। কিন্তু আমার ভালোবাসা ওর জন্য থাকবে আমৃত্যু। ওকে দেয়ার জন্য শামুকের ওপর সুন্দর করে ওর নাম লিখিয়েছিলাম আজ সেটিই একমাত্র সম্বল আমার ভালোবাসার স্মৃতি স্বরূপ।

ভাবতে ভীষণ অবাক লাগে, DV কারো জীবনে স্বপ্ন হয়ে আসে আর আমার জীবনে হয়ে এলো দুঃস্বপ্ন হয়ে!

নাম ও পূর্ণ ঠিকানা বিহীন, সিরাজগঞ্জ থেকে

ছায়া

এম.এইচ.আর. মাসুদ রানা

সেদিন ছিল অমাবস্যার রাত। গিয়েছিলাম আমার নানির বাড়ি। নানির বাড়িতে একাই ঘুমিয়েছিলাম। আমি যে ঘরে ঘুমিয়েছিলাম সেটি ছিল পশ্চিমমুখী। ঘরের জানালা দিয়ে তাকালে নানাদের সুপারি বাগান দেখা যেতো।

প্রতিদিন জানালা দিয়ে ঘুমাতাম। সেই দিন জানালা না দিয়ে ঘুমিয়েছিলাম খালার বাসা থেকে ক্লান্ত দেহে ফিরে এসে। হঠাৎ মাঝ রাতে একটা শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আস্তে আস্তে চোখ খুলে

দেখি সম্পূর্ণ ঘরটা অন্ধকার। প্রতিদিন হারিকেনটা জ্বালানো থাকতো। আজ তা নেভানো। জানালা দিয়ে বাইরে সুপারি বাগানের দিকে চেয়ে দেখি কিসের যেন একটা আলো দেখা যাচ্ছে আর আলোর আকৃতিটা একটা মানুষের মতো।

আমার শরীরটা ছমছম করে উঠলো। বুকটা ধড়ফড় শুরু করলো। দেখি আলোটা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং তা সামনের দিকে এগিয়ে আসছে।

এক সময় আমার জানালার কাছ এলে দেখি একটা মেয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।

মেয়েটা একটা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। বললো, আমার হাত ধরো।

ভয়ে ওর হাত ধরতে পারলাম না।

মেয়ে বললো, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

বললাম কোথায়?

মেয়েটা বললো, আমাদের দেশে।

আমি বললাম, কেন যাবো?

মেয়েটা বললো, তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি।

বললাম, তা সম্ভব নয়। আমি আমার বাবা মাকে ভালোবাসি। তাদের ছেড়ে যেতে পারবো না।

মেয়েটা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

বুঝতে পারলাম মেয়েটা খুব কষ্ট পেয়েছে। ঠিক সেই সময় নানির ঘুম ভেঙে গেল।

বললো, কি রে মাসুদ, কার সঙ্গে কথা বলছিস? এই বলে হারিকেন নিয়ে আমার রুমের দিকে আসেন।

মেয়েটা তখন বললো, আসি।

আস্তে আস্তে ও মিলিয়ে গেল।

নানিকে বললাম সেসব কথা।

নানি শুনে আমাকে নিয়ে গেলেন একটা ফকিরের কাছে। ফকির আমাকে একটা তাবিজ দিলেন আর পানি পড়া খাওয়ালেন।

এরপর সেই মেয়েটাকে আর কখনো দেখিনি। তবে মাঝে মধ্যে সেই শব্দটা এখনো শুনি। বিশেষ করে নানির বাড়ির সেই রুমটায় ঘুমালে।

আমার এই ঘটনাটি অনেকের কাছে বলেছিলাম। অনেকে বিশ্বাস করেছে, অনেকে বিশ্বাস করেনি। তবে আমি তো জানি ঘটনাটা সত্য।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

রহস্য

– মঈনুল ইসলাম নান্না

১৯৮৫ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করলাম। আমাদের স্কুল ছিল সুনামগঞ্জ জেলার সবচেয়ে নামজাদা স্কুল। একমাত্র সরকারি বয়েজ স্কুল।

এইচএসসি–তে ভর্তি হলাম শহরের একমাত্র সরকারি কলেজে। আমাদের সঙ্গে সায়েন্সে তিনটি মেয়ে ভর্তি হলো। একজন স্থানীয় সরকারি গার্লর্স স্কুলের ছাত্রী। অন্য দুজনের মধ্যে একজনের বাড়ি এই জেলায় হলেও বাবার চাকরির সুবাদে পড়াশোনা করেছে রংপুরে। এসএসসি ওখান থেকেই। তৃতীয় জনের বাড়ি সিলেটে। পড়াশোনা চট্টগ্রামে। সুনামগঞ্জে মামার বাড়ি। এইচএসসি মামার বাড়িতে থেকে পড়বে।

আমার কাহিনীর নায়িকা এই তৃতীয়জন। সঙ্গত কারণেই তার নাম গোপন রাখলাম। কাহিনীর প্রয়োজনে ধরে নিই তার নাম শিশির (তার মূল নামের অর্থ)।

আমার নাম ভালো ছাত্রদের সঙ্গেই উচ্চারিত হতো। যদিও সারা বছর রুটিন করে পড়তে পারতাম না। আমার পড়ার একটা নিজস্ব নিয়ম ছিল। পড়তাম পরীক্ষার আগের দুই থেকে তিন মাস। একেবারে নাওয়া–খাওয়া ভুলে, চোখ–কান বন্ধ করে পড়া। এছাড়া সারা বছর মেতে থাকতাম পড়ার বাইরের অন্যান্য বিষয় নিয়ে। আবৃত্তি, অভিনয়, বিতর্ক, রোভার স্কাউটিং, এমনকি ছাত্র রাজনীতি সব কিছুতেই প্রথম সারিতে ছিলাম। অল্পবিস্তর লেখালেখিও করতাম। সব মিলিয়ে দিনগুলো কাটছিল স্বপ্নের মতো।

তখন শহরের হাতে গোনা দুই তিন আবৃত্তিকারের মধ্যে আমি একজন। আর এই আবৃত্তি করতে গিয়েই শিশিরের কাছে আসা।

৩১ ডিসেম্বর। ১৯৮৫। শহরের পল্লী উন্নয়ন মিলনায়তনে আয়োজন করা হয় শেষ বিকেলের কবিতা ও গান। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করে শিশির। *নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ*। চমৎকার আবৃত্তি।

ওই অনুষ্ঠানে অংশ নিইনি।

অনুষ্ঠানের পর সহপাঠীদের মধ্যে বলাবলি শুরু হলো, এই আবৃত্তি আমার চেয়েও ভালো মানের।

কিন্তু আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তা মানতে নারাজ। শ্রেষ্ঠত্বের এক নীরব যুদ্ধ শুরু হলো দুজনের মাঝে।

এর মাঝে এলো কলেজের বার্ষিক মিলাদ। মিলাদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতার নির্ধারিত কবিতা ফররুখ আহমেদের সিরাজাম মুনিরা।

সবাই ধরে নেয় এ প্রতিযোগিতাই হবে ফাইনাল শোডাউন।

এ সময় একটা ছোট্ট সমস্যা দেখা দেয়। কবিতাটির স্ক্রিপ্ট কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। হঠাৎ একটা পুরনো ইসলামি ম্যাগাজিনে কবিতাটি খুজে পাই।

প্রায় সব প্রতিযোগীই আমার কাছ থেকে কবিতাটি নেয়।

শিশিরও চায়।

কিন্তু আমার ভুলো মনের কারণে দুবার তারিখ করেও তাকে দিতে পারিনি।

তৃতীয় দিন সকালে ছিল গণিতের গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্লাস। কলেজে যেতেই লেডিস কমনরুম থেকে বেরিয়ে এলো শিশির।

লজ্জিতভাবে আনতে ভুলে গেছি বলতেই এক চোট নিল। আমি নাকি প্রতিদ্বন্দ্বীতার ভয়েই ওকে কবিতাটি দিচ্ছি না।

ক্লাস বাদ দিয়ে বাসায় এসে স্ক্রিপ্ট নিয়ে আবার গেলাম।

এবার সে দুঃখ প্রকাশ করলো।

প্রতিযেগিতা হলো। অসাধারণ উপস্থাপনা হলো আমার। আবৃত্তি করেই বুঝতে পারছিলাম, আজ আমার দিন। হলোও তাই। ফল ঘোষণার পর শিশিরই প্রথম অভিনন্দন জানালো আমাকে।

এরপর ক্লাসে একটু অনিয়মিত হয়ে পড়ি। আমাদের নাট্যদল নতুন নাটক নামাবে। অনুশীলনে মহা ব্যস্ত আমি।

কিছুদিন পর কলেজে গিয়ে দেখি, আমার ডেস্কে আমার ও শিশিরের নাম জড়িয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্তা লেখা। একটু খটকা লাগলো। আমার একটা ছদ্মনাম ছিল যা আমার ঘনিষ্ঠ তিন বন্ধু ছাড়া ক্লাসের অন্য কেউ জানে না। অথচ এ নামটিই ব্যবহার করা হয়েছে।

আমার বন্ধুদের কাজ এটা নয়। হঠাৎ মনে পড়লো, সিরাজাম মুনিরার ম্যাগাজিনে এ নাম লেখা ছিল। তবে কি কাজটি শিশিরের বা তার বান্ধবীদের। হৃদয়ে দোলা লাগলো আমার।

ওই দিনই শিশির আমার কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *কথা ও কাহিনী* বইটি চায়।

পরদিন ছিল ১১ মার্চ ১৯৮৬। তাকে বইটি দিই। বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় কয়েকটি কথা লিখি। লেখার জন্য কাগজই ভালো, যা চাই তা পাই না কেন, এ জাতীয়।

ওই দিনই সে বইটি ফেরত দেয়। আমার লেখার নিচে তার ছোট ছোট উত্তর। তুমি খুশি হবে? চাইতে জানতে হয়, এ রকম।

এরপরই তাকে প্রপোজ করলাম।

শুরু হলো এক নতুন অধ্যায়ের। প্রতিদিন টিফিনের ফাকে ও ক্লাসের শেষে আমাদের কথা হতো, চিঠি দেয়া-নেয়া হতো। কিন্তু মফস্বলের ছেলে আমি কখনো ওর হাতটিও ছুইনি। ও এ রকম কিছু চাইতো বলে মনে হতো না।

ঘোরের মধ্যেই কেটে গেল কয়েকটি দিন। এলো ৮ এপৃল ১৯৮৬।

হঠাৎ ফোন করলো শিশির। সে চট্টগ্রাম চলে যাচ্ছে। পড়শোনা ওখানেই করবে।

প্রচণ্ড কষ্ট পেলাম। চলে গেল শিশির।

এরপরের কাহিনী অদ্ভুত। শিশিরের বাসাতে একটা মেয়ের নামে (নীনা) চিঠি লিখতাম।

সে আমার বাসায় লিখতো একটা ছেলের নামে (রতন)।

তাকে নিয়মিত লিখলেও সে লিখতো অনেক দিন পর।

এর মাঝে আমার দুই বন্ধু চট্টগ্রাম যায়। ওরা শিশিরের বাসাতেও যায়। পরিচয় দেয় নীনার ভাই ও ভাইয়ের বন্ধু। যথেষ্ট সমাদর পায় ওরা।

ওরা আসার পর শিশির এক নতুন ঠিকানা দেয়। ওর বান্ধবীর স্বামীর।

ভদ্রলোক পুলিশ অফিসার ছিলেন। ওই ঠিকানায় স্বপরিচয়েই চিঠি দিতাম আমি।

সেও স্বপরিচয়ে লিখতো আমার এক বন্ধুর ঠিকানায়। কিন্তু নিয়মিত না।

এভাবে কেটে গেল আরো কয়েকটি দিন। এলো জুন, ১৯৮৭। এইচএসসি পরীক্ষা। প্রচণ্ড ব্যস্ত আমি লেখাপড়া নিয়ে।

১৩ তারিখ পরীক্ষা শুরু হবে। ৯ তারিখ শিশিরের একটি চিঠি পাই। ৪ তারিখে পোস্ট করা। এক চিঠিতেই সব সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে সে। কারণ ওই গতানুগতিক গল্প। আমার প্রতিষ্ঠিত হতে

আরো অন্তত সাত আট বছর লাগবে। ততোদিন তার পরিবার অপেক্ষা করবে না। এক বছরের মধ্যে বিয়ে হয়ে যাবে তার।

ভেতরটা শূন্য হয়ে গেল। কিন্তু লাইনচ্যুত হলাম না। ভাঙা মন নিয়েই পরীক্ষা দিলাম। শিশিরকে ভুলতে আরো বেশি করে পড়তে লাগলাম। সেই দুঃসময়ে আমার সেই তিন বন্ধু প্রচণ্ড মেন্টাল সাপোর্ট যুগিয়েছিল।

রেজাল্ট বের হলো। সারা জেলায় একটি মাত্র ফার্স্ট ডিভিশন। আমি।

আজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। ১৯৯২ সালে বিয়ে করেছি ছাত্র অবস্থায়ই প্রেম করে এবং পরিবারের অমতে। প্রায় দুবছর আলাদা ছিলাম, পরে সব ঠিক হয়ে যায়।

শিশিরের জন্য কোনো শূন্যতা অনুভব করি না। সে এখন কোথায় আছে, কি করছে, আমার জানা নেই। সে কেন আমার জীবনে এসেছিল, কেনই বা জোর করে ভালোবেসেছিল, কেনই বা চলে গেল আর কেনই বা এইচএসসি পরীক্ষার নয় দিন আগে অমন চিঠি দিল তা আমার জীবনে রহস্যই রয়ে গেছে।

সিলেট থেকে

ইন্টারনেটের ফাদে

- তামান্না রহমান

প্রেমের এই ফাদ পাতা ভুবনে কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে। এই কথাটা শতকরা একশ ভাগ সত্যি হয়ে গেল আমার জীবনে। ইন্টারনেটের ফাদে পড়ে সোনালি ডানায় ভর করে আমার জীবনেও প্রেম এলো। সেদিন কি বার ছিলো বা কতো তারিখ ছিল মনে নেই যখন তাকে আমার মেসেনজার লিস্টে অ্যাড করেছিলাম।

প্রতিদিন আমার অনেক ই-মেইল আসে। তার মধ্যে কেউ কেউ বিশেষ মানুষ থাকে যার মেইলের জন্য অপেক্ষা করি। এটা ঠিক যে সবার মেইলই রিপ্লাই করি না। তবে কারো কারো মেইল এতো সুন্দর থাকে যে, মায়া হয়। তখন রিপ্লাই না দিয়ে পারি না। তেমনই একটা মেইল এলো কায়েসের ফ্রেন্ডশিপের অফার নিয়ে।

একটা ওয়েবসাইটে আমার কমেন্টস দিয়েছিলাম, সেখানে আমার ই-মেইল অ্যাড্রেস ছিল। সেখান থেকে সে আমাকে মেসেজ পাঠিয়েছে। তার মেইলের কোনো রিপ্লাই না দিয়ে তাকে আমার মেসেনজারে অ্যাড করে নিলাম। তারপর প্রতিদিন আমাদের অনলাইনে দেখা হয়।

কায়েস থাকে লন্ডনে। বিজনেস করে। ওর ফ্যামিলি ওখানে সেটলড। যখন আমার অফিস ছুটির সময় হয় তখন ওর অফিস শুরু হয়। তাই আমরা বেশিক্ষণ চ্যাটিং করতে পারি না।

এভাবে প্রতিদিন অনলাইনে কথা বলতে বলতে সে আমার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়লো।

তাকে বললাম ইন্টারনেটে মেয়েদের নাম দিয়ে অনেক ছেলে চ্যাটিং করে তাই তাকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বললাম।

সে বললো, কি করে বুঝবো এখন আমি যার সঙ্গে চ্যাট করছি সে ছেলে, না মেয়ে?

তাকে বললাম, সন্দেহ থাকলে আমাকে ফোন করো। তাকে ফোন নাম্বার দিলাম।

সে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফোন করলো।

শুধু এক মিনিট তার সঙ্গে কথা বললাম। কারণ সামনে আমার কলিগরা ছিল তাই আমাদের মধ্যে বেশিক্ষণ কথা হতে পারেনি।

ফোনে কথা বলার পর ও আমার জন্য পাগল হয়ে গেল।

এরপর তাকে আমার ছবি পাঠালাম।

ছবি দেখে সে প্রেমে পড়ে গেল।

তারপর থেকে কখন আমাদের মধ্যে প্রেমের অধ্যায় শুরু হয়ে গেল, আমরা কেউ টের পেলাম না। অনলাইনে কথা বলার সময়ই সে আমর জন্য পাগল ছিল। এরপর ফোনে কথা বলার পর সে আরও ক্রেজি হয়ে পড়লো আমার জন্য।

অফিসে এসেই সে অনলাইনে আমার জন্যে অপেক্ষা করে। আমার অনলাইনে যেতে দেরি হলেই ফোন করে বকা দেয়।

এভাবে প্রতিদিন ইন্টারনেটে এবং ফোনে কথা বলে আমাদের ভালোবাসার দিনগুলো দুই সপ্তাহ পেরলো। আমরা দুজনই দুজনার জন্যে পাগল হতে লাগলাম।

একদিন ফোনে দুষ্টুমি করে তাকে *আই লাভ ইউ* বললাম যাতে সে আরো পাগল হয়ে যায়। কারণ আমার জন্য তার এই পাগলামি আমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী নারী করে তোলে। যাই হোক। এর কয়েকদিন পরেই ছিল ভ্যালেনটাইনস ডে। সে বললো, ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে তোমার জন্য সারপ্রাইজ আছে।

বললাম, অতোদূর থেকে তুমি কি সারপ্রাইজ দেবে?

সে বললো, অপেক্ষা করো।

তারপর ভুলে গেলাম সে কথা।

সেদিন অফিসে গিয়ে আমার মেইল বক্স ওপেন করতেই দেখি ফ্রেন্ডরা ভ্যালেন্টাইনস গৃটিংস পাঠাতে শুরু করেছে। কেউ কেউ আমাকে তাদের ভ্যালেন্টাইন সিলেক্ট করেছে। আর আমি যাকে আমার ভ্যালেন্টাইন সিলেক্ট করেছি, সে কোথায়?

চিন্তায় অস্থির, তিনটা থেকে চারটা বাজতে চলেছে, তারপরও ওর দেখা নেই। কাজের ফাকে ফাকে মেসেনজার ওপেন করে অপেক্ষা করছি। কিন্তু ওকে অনলাইনে দেখছি না। মোবাইলে মেসেজ দিলাম। নো রেসপন্স। কি করি, আমার টেনশন হতে লাগলো।

এভাবে সারা দিন ওর চিন্তায় পার করে দিলাম।

বাসায় গিয়ে মোবাইল নিয়ে অপেক্ষা করছি যদি ও ফোন করে! কিন্তু না, এখন রাত বারোটা বাজে, তার কোনো খবর নেই। যে মানুষ আমাকে এক মুহূর্ত অনলাইনে না দেখলে অস্থির হয়ে যায়, ফোন করলে সহজে রাখতে চায় না সেই মানুষটা হঠাৎ কোথায় গেল আমাকে না জানিয়ে।

তার চিন্তায় আমার জ্বর এসে পড়লো। রাত বাড়তে লাগলো আর জ্বরের ঘোরের মধ্যেও মন থেকে দুশ্চিন্তাটা সরাতে পারছি না। এভাবে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

ভোর ছটায় মোবাইল বেজে উঠলো।

জ্বরের ঘোরে মোবাইলটা ধরলাম।

ওপাশ থেকে কেউ *হ্যাপি ভ্যালেন্টাইনস ডে* উইশ করলো।

আনন্দে উঠে বসলাম, তুমি কি বলোতো? কাল থেকে আমাকে এতো টেনশনে রেখেছো, আমার তো টেনশনে জ্বর চলে এসেছে।

ও তখন হাসছে ও বললো, জ্বর হলে তো চলবে না, আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে আজ। কি বলবো ভেবে পেলাম না। শুধু বললাম, তুমি এখন দেশে।

সে হাসছে! বললো, তোমাকে না বলেছিলাম, ভ্যালেন্টাইনস ডে–তে তোমাকে সারপ্রাইজ দেবো। *ভালোবাসার দিনে* তোমাকে দেখবো বলে চলে এলাম।

আমার আনন্দ আর ধরে না। কাল সারা রাত আমার জ্বর ছিল এ কথা আমার এখন মনে নেই। তাড়াতাড়ি গোসল করে সুন্দর একটা শাড়ি পরে রেডি হয়ে গেলাম।

আজ আমার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে দেখা হবে সে সুদূর ইংল্যান্ড থেকে শুধু আমাকে দেখার জন্য, আমাকে ভ্যালেন্টাইনস ডে উইশ করার জন্য ছুটে এসেছে। আজ যে আমার দিন, আমার ভালোবাসার গোলাপ রাঙানো দিন।

ফাল্গুনের দক্ষিণা হাওয়ার সঙ্গে ট্যাকসি ক্যাব ছুটে চলেছে হোটেল সোনারগাওয়ের দিকে।

সোনারগাও হোটেলের লবিতে বসে অপেক্ষা করছি ওর জন্যে। বুকের ভেতর এক শিহরণ, খুব নার্ভাস লাগছে। মোবাইল বেজে উঠলো।

ও বললো, তুমি কোথায়?

তাকে লবির দিকে আসতে বললাম।

দেখছি এক সুদর্শন যুবক মোবাইলে কথা বলতে বলতে আমার দিকে আসছে। আমি হাসলাম। আমার হাতের লাল গোলাপ তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

আমাদের দুজনকে নিয়ে গাড়ি আশুলিয়ার দিকে ছুটে চলেছে। আশুলিয়া হচ্ছে প্রেমের তীর্থস্থান। তাই আমার ভালোবাসার মানুষকে আশুলিয়া দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি। গাড়িতে হিন্দি রোমান্টিক গান বেজে চলেছে আর আমরা দুজনে সেই গানের আবেশে দুজনার প্রেমকে উপলব্ধি করছি।

হোটেল থেকে আমরা লাঞ্চ করে বেরিয়েছিলাম। তাই খাওয়া দাওয়ার কোনো চিন্তা ছিল না।

আশুলিয়ার লেকে বেশি পানি নেই। কিন্তু নৌকা চলছে। দুজনে নৌকায় বসে আছি। গাড়িতে এতোক্ষণ মন খুলে কথা বলতে পারিনি, ড্রাইভার ছিল তাই। এখন নৌকাতে দুজনে দুজনকে অনেক কাছে পেলাম। অনেক কথা বলবো বলে ভাবলাম। কিন্তু কথা কোথায় হারিয়ে গেল জানি না।

দুজনে দুজনকে দেখছি। আমার লজ্জা করছে। ওর চোখের দিকে তাকাতে পারছি না।

ও আমার চুলকে নিবিড়ভাবে ছুয়ে বললো, এতো দূর থেকে ছুটে এলাম তোমার কাছে শুধু তোমাকে দেখার জন্য। আর তুমি এতো দূরে সরে আছো কেন? তোমার নরম ঠোটের স্পর্শ আমাকে দাও।

লজ্জায় পানির দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বললাম, এখানে মাঝি আছে, ও সব দেখছে, আমি পারবো না।

ওর মন খারাপ হয়ে গেল। ও বললো, আজ ভালোবাসার দিন, আজ ভালোবাসার মানুষকে যদি ভালোবাসার ছোয়া না দাও তবে কেমন প্রেমিকা তুমি?

ও আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। আমার খুব মায়া হতে লাগলো। আমার ঠোটকে লিপস্টিক দিয়ে আরো গাঢ় করে নিলাম।

ও আমার দিকে তাকিয়ে দেখছে। বললো, এতো লিপস্টিক দিচ্ছ কেন?

বললাম, প্রমাণ থাকবে। তারপর ধীরে ধীরে আমার রক্তিম ঠোট দুটি ওর মুখের ওপর নামিয়ে আনলাম। ভালোবাসার উষ্ণ পরশে তার ঠোট দুটি রাঙিয়ে দিলাম।

অনেক প্রেমে রাঙানো আমার ভালোবাসার প্রথম পরশ এক ঝলক দক্ষিণা হাওয়া হয়ে আমাদের দুজনকে ভালোবাসার সৌরভে ভাসিয়ে নিয়ে গেল পৃথিবী থেকে অনেক দূরে যেখানে শুধু ভালোবাসার লাল গোলাপ সুরভি ছড়ায় দুটি প্রেমিক হৃদয়ে আর প্রেমিকা বেচে থাকে প্রেমিকের ভালোবাসার উষ্ণতা নিয়ে।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

tamnnas_love@yahoo.co.uk

সুখের সময়

– রিমঝিম

দুই বছর আগের কথা। আমি তখন ক্লাস এইট পাস করে নতুন স্কুলে ঢোকার সুযোগ খুজছি। এ কারণেই রোজ বাবার সঙ্গে বাইরে যেতে হয়।

একদিন বাবার সঙ্গে বেলা নয়টায় বাইরে যাই আর দেড়টায় ফিরে এসে দেখি বাসায় নানা, নানি এসেছেন।

আমার খুব ভালো লাগতো নানা, নানি এলে।

তারপর তারা সবাই বিকেল পর্যন্ত রইলেন। এবার যাওয়ার পালা। কিন্তু তারা এবার আমাদের নিয়েই যাবেন।

বাবা রাজি হলেন না।

তাই আমার মন খারাপ।

অনেক বলার পর বাবা বললেন, আমাকে যেতে দেবেন কিন্তু মা দুদিন পরে যাবেন।

মহা খুশিতে জামা কাপড় গোছালাম এবং তাদের সঙ্গে চলে এলাম।

নানাবাড়ি আমাদের বাসা থেকে বেশি দূরে না। এক ঘণ্টার মতো পথ। তাই নানাবাড়ি গিয়ে পৌছালাম সন্ধ্যা সাতটায়।

সারা রাত খালাদের সঙ্গে মজা করে রাত তিনটায় ঘুমালাম। আমি যে রুমে ঘুমিয়েছিলাম সেখানে বড় একটা জানালা আছে। বাইরে থেকে মানে মেইন দরজা দিয়ে ঢুকলে আমাকে যে কেউ দেখতে পাবে।

সকাল দশটা বাজে। তখন খুব আরামে ঘুম দিচ্ছি। হঠাৎ চোখে আলো এসে পড়লে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। তাকিয়ে খেয়াল করলাম কে যেন আমার শরীরকে অনুসরণ করে আলো ফেলছে।

দেখেও না দেখার ভান করে সোজা হয়ে শুলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখতে পেলাম আলোটা আমার উচু বুক দুটোর ওপর।

চমকে উঠে বসলাম। চারপাশে তাকিয়ে কাউকে না দেখে দৌড়ে বাইরে গেলাম। লম্বা করে সুদর্শন একজন ছেলে দাড়ানো। আমি যাওয়াতে সে ভয় পেল। তার হাত থেকে আয়নাটা পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল।

বললাম, কি ব্যাপার?

সে আমার লাল ঠোটের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো।

তার অবস্থা দেখে আমার শরীর কাপতে লাগলো। সাহস নিয়ে বললাম, এভাবে কেউ তাকায়!

বলার সঙ্গে সঙ্গে সে দৌড়ে এসে আমার ঠোট দুটো চুষতে লাগলো। ইচ্ছে করেও বাধা দিতে পারলাম না। মন সায় দিল, জড়িয়ে ধরলাম তাকে। পাচ মিনিট এমন থাকলাম। হঠাৎ আমার নানির ডাক পড়লো। ইচ্ছে থাকলেও তাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে চলে এলাম।

বুক খুব জোরে জোরে কাপছে। কাউকে বুঝতে দিলাম না। জীবনে প্রথমবার কোনো ছেলের উপস্থিতি টের পেলাম। নাশতা খেয়ে বাথরুমে গিয়ে গোসল সারলাম। তারপর ঘরের এক কোণে বসে বই পড়ার ভান করলাম। কোনো কিছুতেই মন বসছে না।

হঠাৎ ডাক পড়লো রিমঝিম, রিমঝিম।

উত্তর দিলাম।

ছোট মামা ডাকছেন ব্যাডমিন্টন খেলতে।

দৌড়ে নিচে গেলাম।

মামা বললেন, র‍্যাকেট নে।

র‍্যাকেট নিয়ে খেলতে লাগলাম। হঠাৎ সেই সুবাস। আমায় পাগল করে দিল। তাকিয়ে দেখলাম আমার পেছনে দাড়ানো। তাকে দেখে তাকিয়ে রইলাম।

মামা বললেন, রিমঝিম, ও আমার বন্ধু সুমন।

বললাম, ভালো আছেন।

সে তার ঠোট কামড়িয়ে উত্তর দিল, না।

বললাম, কেন? খারাপ কেন আছেন?

সে ঝটপট উত্তর দিল, তোমার জন্য।

আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। কারণ পেছনে মামা দাড়ানো। ভয়ে ভয়ে পিছে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই। তারপর তার দিকে তাকালাম।

সে তার মিষ্টি ঠোট দুটো আমার কানের কাছে নিয়ে এসে আলতো একটা চুমু দিলো।

হাত দিয়ে তাকে বাধা দিলাম।

সে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

পাল্টা উত্তর দিলাম, আপনি আমার সঙ্গে এমন করছেন কেন?

সুমন বললো, তুমি কি জানো, তুমি কতো সুন্দর! তোমার ঠোটের দিকে তাকালে মনে হয় যেন ঠোট দুটো আমায় ডাকছে।

তার কথা শুনে আর এক মিনিটও তার কাছে না থেকে দৌড়ে চলে গেলাম। তখনো জানি না যে, যাকে এড়িয়ে চলছি সে আগামীকাল আমার জীবন বদলে দেবে।

পরের দিন বিকেলে সবাই সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখবে বলে রওনা হয়।

মামাকে বললাম, আমি যাবো না।

সবাই আমাকে নেয়ার জন্য অনেক জোর করে। কিন্তু আমি যাবো না।

শেষে সবাই চলে গেল।

আমি আর আমাদের বাসার বুয়া ঘরে। সাড়ে সাতটা বাজে।

বুয়া বললো, আপা, আমি যাই, আমার ছোট বাচ্চা আছে।

বললাম, ঠিক আছে আপনি যান।

টিভি দেখতে দেখতে সাড়ে আটটা বাজে। হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি চলে যায়। আমি খুব ভীতু মেয়ে। তাই ভয়ে দৌড়ে বাসার সামনে ছাদে চলে এলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে বাইরের বড় দরজায় শব্দ হলো। আমি গিয়ে দরজা না খুলে বললাম, কে ওখানে?

কোনো উত্তর এলো না।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম।

কেউ কিছু বললো না।

সাহস করে এগিয়ে গেলাম। দরজার ফাকগুলো বড় বড়। দরজার সামনে গিয়ে উকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করি। কেউ নেই। দরজা খুলে আশপাশে দেখার চেষ্টা করি।

হঠাৎ পেছন দিয়ে কে যেন আমায় জড়িয়ে ধরলো।

আমার শ্বাস থেমে গেল। সেই মায়াবী গন্ধ আমায় পাগল করা শুরু করলো। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। পেছন ফিরে তাকে সজোরে জড়িয়ে ধরলাম।

সে আমার গলায় চুমু দিতে দিতে কোলে তুলে নিল। তারপর সে আমাকে ছাদের কোণায় নিয়ে গেল। আমাকে শুইয়ে দিল। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত আদর করলো। সেদিন আমাকে চিরসুখী ভাবতে বাধ্য হয়েছি।

তারপর যা হওয়ার তাই হলো।

সে সুখের সময় পার হবার পর সুমন আমার নরম বুকের ওপর অনেকক্ষণ শুয়ে থাকে।

ওর চুল নাড়তে নাড়তে বললাম, এগুলো কি ঠিক হলো?

ও বললো, রিমঝিম, I love you আমি তোমাকে ছাড়া বাচবো না।

দুষ্টুমি করে বললাম, তবে চলো বিয়ে করি।

সুমনের উত্তর এলো এভাবে – আমিও তাই চাই Jaan। তোমার এই লাল ঠোট ছাড়া আমি বাচবো না। এই বলে সে আমার ঠোট চুষতে লাগলো।

সেই রাত ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের।

দুই বছর হয়ে এসেছে। তবুও আমরা তেমনিই মিলিত হই। কিন্তু এখন আর রিমঝিম নই। মিসেস সুমন নামে সবাই আমাকে চেনে। আমাদের পাচ মাসের ছোট একটা বাবু আছে। আমার স্বামী আমাকে খুব ভালোবাসে। আমরা দুই বছর আগেই বিয়ে করেছি। কারণ সুমন তখন বিএ পাস করে

ব্যবসা করছিল। তার চেয়ে আমি সাত বছরের ছোট। তাতে কি এসে যায়! ভালোবাসার চেয়ে বড় কিছু নেই। আমি এখন এসএসসি পরীক্ষায় পাস করে বাবুকে নিয়ে থাকি।

খুলনা থেকে

প্রতিবন্ধকতা

– লাল সাহেব

ডেপুটেশনে উচ্চতর পদে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করার পর তার কথা জানতে পারি। তিনি এক সময় এ প্রতিষ্ঠানে ছিলেন আবার আসছেন। শুনে নাক গলালাম। বললাম, আগের থেকে এক ধাপ উপরের পদেই আনা হোক। সুপারিশে কাজ দিল।

একদিন অফিস পরিদর্শনে বের হলে প্রধান কর্তাসহ প্রথমে তার রুমে যাই। বিশেষ স্থানগত বিষয়ে চেহারার আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে বিন্যস্তভাবে থাকেন বলে মনে হলো না। এর পেছনে কোনো কারণ থাকতে পারে। অবশ্য জবা ফুলের মতো লাল টুকটুকে ঠোটের সঙ্গে হাসি লাগিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছেন। আপ্যায়নে আমার প্রতি একটু বেশি মনোযোগী ছিলেন।

এরপর থেকেই প্রয়োজনে–অপ্রয়োজনে তিনি প্রায়ই আমার রুমে আসতেন। কখনো চা খেয়ে বিদায় নিতেন, কখনো সালামের সঙ্গে একটি মিষ্টি হাসি দিয়ে চলে যেতেন।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, এখন তিনি আগের থেকে বেশ সেজেগুজে চলাফেরা করেন। এ রকম সাজগোজের কারণে রুমে এলে বিব্রত বোধ করি। আবার চলে গেলে অপ্রয়োজনে ফোন করি, কখনো আমিই চলে যাই, চেহারাখানা দেখেই চলে আসি। আমার ভেতরে দুর্বলতা বাসা বাধতে চায়, প্রতিহত করি। কিন্তু যখন শুনি ভদ্রমহিলার স্বামী নামকরা ব্যক্তিত্ব, অসুস্থতার কারণে ঘরবাসী হয়ে গেছেন তখন দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মায়াও করে। ইদানীং একটি করে নতুন মাত্রা যোগ হতে থাকে। অফিস শেষে গাড়িতে বাসায় যাওয়ার সময় তিনিও যাবেন। কারণ জানতে চাইলে বলেন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। এ কারণে আমি ড্রাইভারের প্যাশের আসনে বসি।

তিনি ডাকেন। শুনি না বলে তিনি মনঃক্ষুণ্ন হন। অসুস্থ বোধ করাতে খবর পেয়ে তিনি আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান এবং ঠায় তিন ঘণ্টা আমার পাশে বসে উস–খুস করছিলেন। সেখান থেকে বের হলে তার আবদার, নিউ মার্কেটে গিয়ে যেন একটি অলংকার পছন্দ করে দিই। আমার পছন্দেরটিই তিনি কিনবেন এবং করলেনও তা।

এরপর হঠাৎ আমার হাত টেনে নিলেন দুই হাতকে যেন আদর করছেন দোকানের মধ্যে বিব্রতকর অবস্থা। এরই মাঝে একটি দাবি আংটি পরিয়ে দিয়ে বললেন, দারুণ, চমৎকার।

বললাম, টাকা নেই, কিনবো না, শখ বা অভ্যেসও নেই।

তিনি বললেন, এটি গিফট।

মাঝে মধ্যে আমার বাসায় আসেন। তবে বসেন না, দেখা দিয়েই চলে যান।

জোর করার কারণে কয়েকবার তার বাসায় যেতে হয়। নাশতা খাওয়ানোর সুযোগে তিনি খুব ঘনিষ্ঠ হতে চান অথবা কথা বলার ফাকে।

অস্বস্তি বোধ করি, তাড়াহুড়ো করে চলে আসি।

সব কিছু অংকের মতো যোগ বিয়োগ করে দেখি। পদমর্যাদা, বয়স, অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, পাশাপাশি তার পরিবার, ঘর-সংসার, সন্তান, অসুস্থ স্বামী ইত্যাদি আমার কাছে গুরুত্ব পায়। বিশেষ করে অসুস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব স্বামী বেচারা, তিনি কোথায় যাবেন এবং তাকে দেখাশোনা করবে কে? সতর্ক হতে চেষ্টা করি।

কিন্তু দেখলে বা ফোন পেলেই কাতর হয়ে পড়ি।

এর মধ্যে কিছু ঘটনা ঘটে। তিনি প্রায় আমার বাসায় নাশতা, ফল এবং মাঝে মধ্যে গিফট পাঠান। কিন্তু অফিসে তাকে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন দায়িত্বের কথা বলে (যার সবই মিথ্যা), অজুহাত দেখিয়ে অফিসে অনুপস্থিত থাকেন। এ জন্যে তাকে মৌখিকভাবে সতর্ক, অফিশিয়াল প্যাডে সতর্ক, অফিশিয়াল সতর্ক, কারণ দর্শানো পত্র ইত্যাদি প্রক্রিয়ায়ও যখন কাজ হয় না তখন তার ইনকৃমেন্ট উইথহোল্ড এবং বেতন বন্ধ করে দেয়া হয়।

একদিন ফোনে তিনি আমাকে বিশ্রী কথাবার্তা বলেন। বলেন, ভোগ করতে চাইলে হোটেল থেকে শুরু করে যেখানে ইচ্ছে সেখানে নিয়ে যেতে পারি। অফিশিয়াল একজনের কারণে মান-অভিমানের সঙ্গে রাগও জুড়ে দিয়ে আমাকে এক হাত নিলেন।

এ সকল ঘটনার পর থেকে দুজনের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে। সত্যি কথা হলো, আমার কাছে অফিস এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্পূর্ণ আলাদ ব্যাপার। সে খারাপ ব্যবহার করলেও তাকে দেখার জন্য তার রুমে যাই, ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্যে সরি বলি। তিনি কোনো কথা বলেন না, সজোরে চোখের পানি পড়তে থাকে।

তখন এক চুম্বক আকর্ষণে আদর করার বাসনা জাগে। কঠিন শিলা বুকে বেধে চেয়ার ছেড়ে চলে আসি তিনি শুধু চেয়ে থাকেন।

এরপর যতোবারই দেখা হয়েছে সে কথা বলেননি, শুধু এক পলকে তাকিয়ে থাকেন।

বদলি হয়ে চলে আসার সময়ও একই ঘটনা। অফিশিয়াল সমস্যা সব ঠিক করে দিয়েছি। কিন্তু তার মুখ ফোটাতে পারিনি। কোনো কথা বলেননি। আবেগময় দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেছেন।

আজ আমি অনেক দূরে। কিন্তু মন থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারিনি। অসংখ্য কবিতা, চিঠি লিখেছি এবং লিখছি, ঠিকানা জানা থাকা সত্ত্বেও পাঠাতে গিয়ে পাঠাই না। ফোন নাম্বার জানা থাকলেও ডায়াল করে দ্রুত কেটে দিই। আসলে এ সব কিছু ব্যক্তিগতভাবে করি না। ওই অসুস্থ ব্যক্তিত্ব হঠাৎ মাঝখানে এসে পাহাড়ি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

পাশে নেই

– পাখি

আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। আমরা দুই বোন, এক ভাই। বোনের মধ্যে আমি ছোট। আমি পরিবারের সবার থেকে একটু আলাদা চরিত্রের। বিশেষ করে বড় আপার চরিত্রের উল্টোদিক হলো আমার। বড় আপা সবার সঙ্গে মিশতে ভালোবাসেন। আর আমি তার উল্টোটা।

তখন বেশ ছোট ছিলাম। যখন ক্লাস নাইনে ছিলাম তখনো ভালোবাসার প্রতি আমার ঘৃণা ছিল। কিন্তু জীবনের মোড় কিভাবে ঘুরে যায় তা বোঝা যায় না।

ক্লাস নাইনের ছয় মাস পার হতে না হতেই আমার জীবনে ভালোবাসা নামের সেই ছায়া এসে আমার সব ঘৃণা ঢেকে দিল। তখন ভালোবাসার মানে বুঝতে পারলাম যে আমার ভালোবাসা তার নাম...।

সে আমাকে ১৫ জুন ঠিক দুপুরে একটা সাইবার কাফেতে রিমঝিম বৃষ্টির মাঝে আমাকে তার হৃদয়ের কথা জানালো।

সরাসরি কিছু না বলে ভাবে বুঝিয়ে দিলাম রাজি। তার পরের দিন রাতে সে মোবাইলে সাতবার বলেছিল যে, সে আমাকে ভালোবাসে।

আস্তে আস্তে তার প্রতি দুর্বল হই এবং সেও আমাকে আরো বেশি ভালোবাসতে থাকে।

গত ভালোবাসা দিবসে সে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাদের জেলায় এসেছিল। হরতালের জন্য তার সঙ্গে দেখা হলো না। পরের দিন ১৫ ফেব্রুয়ারি তার সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎ হয়। সেইদিন ও আমাকে অনেক আদর ও ভালোবাসা দিয়েছিল আমার...। আমার ওই দিনটি স্মরণীয় হয়ে আছে। ওই দিনটার কথা কি ভোলা যায়!

আমার সব কিছুই ঠিক আছে। কিন্তু সে আমার পাশে নেই। আমার কাছ থেকে সে আজ ছয়শ মাইল দূরে। আমরা মোবাইলে উইশ করি দিনটিকে। কাছে না পাওয়ার কষ্ট থাকবে আমার এই বুকের মাঝে।

তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। জীবনের প্রথম ভালোবাসা। তবে আমার পরিবার তাকে জেলার লোক বলে মেনে নিতে রাজি না। কিন্তু সব দিক দিয়ে সে উপযুক্ত। পড়াশোনা, স্মার্ট, ভালো পরিবার। তবুও আমার পরিবার তাকে মেনে নিতে চায় না। অবশ্য সে পরিবারকে এখনো ব্যাপারটি জানায়নি।

সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করছে।

আমি এখন এইচএসসি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। আমাদের ইচ্ছা আমি এইচএসসি পাস করলে এবং সে বিদেশ যাওয়ার পর সব কথা পরিবারকে জানাবো। তারপর আমরা দুজনে সিদ্ধান্ত নেবো। পরিবারকে মানাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

আমরা এখনো টিকে আছি আমাদের ভালোবাসায়। আশা রাখি, আমাদের বিয়ে পর্যন্ত টিকে থাকবো। এ আমার মনের পবিত্র বিশ্বাস।

সকল প্রেমিক প্রেমিকা আমাদের বিয়ের জন্য দোয়া করবেন যেন আমরা পারিবারিকভাবে বিয়ে করতে পারি।

শেরপুর থেকে

এল- সিক্স

অনেকেই মনে করে ছেলেমেয়ের বন্ধু মানে প্রেমিক–প্রেমিকা। এছাড়া যেন অন্য সম্পর্ক হতে পারে না। কিংবা হয় না। আমি আবার এ ধারণা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করি।

ছেলেমেয়ের নিষ্কণ্টক বন্ধু এই সমাজে যে দুর্লভ তা নয়। আসল কথা হলো, আমরা যদি আমাদের মনকে সংকীর্ণ করে ফেলি তাহলে ছেলে মেয়ের মধ্যে সত্যিকার যে বন্ধু তা পাওয়া খুবই কষ্ট সাধ্য।

ছেলে–মেয়ের সত্যিকারের বন্ধুর মধ্যে যে চাওয়া–পাওয়া তার সাথে যদি প্রেমিক–প্রেমিকার চাওয়া–পাওয়া তুলনা করা হয় তাহলে প্রকৃত বন্ধুত্বের চাওয়া–পাওয়া মুখ থুবড়ে পড়বে। উভয় ক্ষেত্রের কামনা–বাসনা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বান্ধবীর সীমাবদ্ধতার কারণে তার আসল নাম ঠিকানা উল্লেখ করতে পারছি না। সংক্ষিপ্তভাবে তো একটা নাম দিতেই হয়। ঠিক আছে, তার নাম দিলাম এল–সাব–সিক্স, বড় হয়ে গেল তাই না? ঠিক আছে আরো সংক্ষিপ্ত করে তার নাম রাখলাম এল–সিক্স।

যাকগে, নামে কি বা এসে যায়। গোলাপকে যেই নামেই ডাকা হোক না কেন, সুগন্ধ তার ঠিকই থাকে। ঠিক আছে কথা দিচ্ছি আর বিরক্ত করবো না। আসুন, তাহলে এবার যাওয়া যাক মূল প্রসঙ্গে।

সম্ভবত এল–সিক্সদের বাসায় যাতায়াত আরম্ভ হয় আমার এসএসসি পরীক্ষার পর থেকে। এল–সিক্সের সঙ্গে তেমন কথাবার্তা বলতাম না কিংবা প্রয়োজন হয়নি। তাই বলিনি।

মাঝে বেশ কয়েক বছর ওদের বাসায় যায়নি। আবার যাতায়াত আরম্ভ করলাম। আস্তে আস্তে এল–সিক্সের সান্নিধ্যে আসতে লাগলাম। ওকে শুধু বন্ধুর মতো ভালো লাগতে আরম্ভ হলো। এখন পর্যন্ত ওকে কেবল বন্ধুর মতো ভাবতে ভালো লাগে।

সম্ভবত আমার জন্য এল–সিক্সের একটা সফট কর্নার আছে। এটা অনেক আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। এখন সম্ভবত সেই সফট কর্ণার আরো প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। কিছু কিছু মানুষের স্বভাব এমন তারা তাদের দুর্বলতার কথা তার কাছে যার প্রতি দুর্বল তাকে বলতে পারে না। হয়তো ভাবে, বললে ছোট হয়ে যাবো কিংবা হেরে যাবো। তাদের ভাবখানা এমন, তাদেরকে সবাই ভালোবাসবে, তারা অন্য কাউকে ভালোবাসবে না। ভালো লাগলেও বলবে না। এছাড়া হয়তো আরো অনেক জড়তা কাজ করে।

এল–সিক্সের সঙ্গে যতো সহজভাবে অবলীলায় কথাবার্তা বলি, এল–সিক্স সেভাবে বলে না। আমার মনে হয়, এল–সিক্স সব কিছুর মধ্যে একটু ভনিতা করে কিংবা আমার বোঝার ভুল হয়তো বা মেয়েদের চরিত্র এই রকম।

কিছু দিন আগে এল–সিক্স আমার হাত আমার মাথার ওপর রেখে ওর প্রতি আমার ফিলিংস কিংবা মনোভাব জেনে নিল। আমি যা সত্যি তা অবলীলায় বললাম। এল–সিক্সও ওর মনের কথা অর্থাৎ আমার প্রতি ওর দুর্বলতার কথা বললো। সেদিন সম্ভবত ওর চোখের ভাষা বুঝতে পেরে ছিলাম। এল–সিক্স যে আমার কথায় কতোটা ব্যথিত হয়েছিল তা লিখে প্রকাশ করা যাবে না। তবে ওকে বলেছিলাম, আমি শুধু তোর কাছে বন্ধুত্ব চাই, অন্য কিছু নয়।

সেদিন এল–সিক্স কথা দিয়েছিল, আমার সঙ্গে শুধু বন্ধুত্ব সম্পর্ক রাখবে।

এর অনেক দিন পরের ঘটনা। একটা ব্যাপার নিয়ে এল–সিক্সে বাজি ধরলাম। শর্ত হলো, যে জয়ী হবে সে বিজিতকে যা করতে বলবে সে তা–ই করবে।

নিশ্চিত ছিলাম আমি জয়ী হবো। হলামও তাই। বুঝলাম না এই পরাজয় এল–সিক্সের ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত। শর্ত অনুসারে আমি এল–সিক্সকে দশটি কিস দেবো।

পরবর্তীকালে আমি আমার শর্ত প্রত্যাহার করে নিই।

অনেক দিন যাবৎ ভাবছি এল–সিক্সের মুখের কাছে আমার মুখ অর্থাৎ ওর ঠোটের কাছাকাছি আমার ঠোট নিলে কিরূপ ফিলিংস হয়। আজ অপ্রত্যাশিতভাবে ওই রকম পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। ছিঃ, এল–সিক্স নিশ্চয় ভেবে নিয়েছে, আমি ওর ঠোট কিংবা মুখমণ্ডল বা স্তন স্পর্শ করতে চেয়েছি। আসলে চেয়েছি ওগুলো না ছুয়ে, না স্পর্শ করে, কাছাকাছি যাওয়ার পর এল–সিক্স কিংবা আমার বাহ্যিক পরিবর্তনগুলো দেখবো।

এল–সিক্সকে আমি প্রেমিকা হিসেবে ভাবতে পারি না। বন্ধু হিসেবে ভাবতে খুব ভালো লাগে। তাই ওর সান্নিধ্য একাকী ওর সঙ্গে আলাপ করতে খুবই ভালো লাগে। ফলে পহেলা এপৃল ওর কাছ থেকে প্রস্তাব এলো ওর সাথে আমার ঘুরতে আপত্তি আছে কি না।

রাজি হয়ে গেলাম।

সেদিন প্রায় সাত ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করলাম অথচ মনে হলো এই মাত্র এলাম। প্রিয়জন পাশে থাকলে কখন যে সময় পার হয়ে যায় বোঝা যায় না।

মেয়েরা অসীম নিষ্ঠুর হয়ে জন্মায়। সময় সুযোগ পেলে সব মেয়েই তাদের নিষ্ঠুরতা প্রয়োগ করে। কেননা এল–সিক্সকে ছয় মাস বাইশ দিন বিভিন্নভাবে অনুরোধ করেও একটা ব্যাপারে মত করাতে পারছিলাম না। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে ধরা ছোয়ার বাইরে থাকে। ধরা দিতেই চায় না।

অবশেষে প্রায় সাত মাস পর আবারও এল–সিক্সের সঙ্গে বাইরে দেখা হলো। অনেক অনুরোধ করার পর সময় দিয়েছে। এল–সিক্স আমার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার হিসেবে নিয়েছিল। এল–সিক্সই বললো অনেক দিন হলো টাকা নিয়েছি। এখনো দিতে পারছি না।

বললাম, সুদ দিতে হবে।

সে বললো, শতকরা কতো?

বললাম, শতকরা একটি কিস। এছাড়াও বাজিতে হেরেছিলি, সেই দশটি কিস–ও এর সঙ্গে যোগ হবে।

এই কথায় এল–সিক্স কি মনে করলো জানি না। তবে এটা ছিল আমার নিছক রসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়।

এক সপ্তাহের মধ্যে আবারও এল–সিক্সের কাছ থেকে প্রস্তাব এলো বাইরে ঘুরতে যাবে আমার সঙ্গে।

আমার কেনো যেন মনে হলো এক সপ্তাহ আগে ঘুরতে গিয়ে যে রসিকতা করেছিলাম সেটার বাস্তবায়ন দেখতে চাচ্ছে।

আমরা পাশাপাশি বসে যখন আলাপরত ছিলাম ওর মনের ভাব জানার জন্য আমাকে Kiss দেয়ার প্রস্তাব দিই।

এতে মেয়েটা যেমন হয়। আমার ডান হাত দিয়ে ওর মাথাটা কাছে টেনে আনি। তখন এল–সিক্স চোখ বন্ধ করে ছিল। ওর ঠোটের কাছে থেকে ন্যূনতম দূরত্বে আমার ঠোট রেখেছিলাম।

তখন ভানুর কৌতুকের ভাষা আমার ভাষা হয়ে গিয়েছিল। দেখি না কি হয়? আমার নিঃশ্বাস ওর ঠোট, নাক ও মুখের ওপর পড়ছিল। অনুরূপভাবে ওরটাও আমার ওপর।

আমি ভেবেছিলাম এই অবস্থায় এল–সিক্স আমাকে সম্ভবত কিস করবে। এল–সিক্সও হয় তো ভেবেছিল আমি ওকে কিস করবো কিংবা অন্য কিছু।

এই পরিস্থিতিতে সম্ভবত এল–সিক্স অপমানিত বোধ করেছে। কেননা একটি মেয়েকে এতো কাছাকাছি পেয়েও ওকে কিস করিনি। কিংবা স্পর্শকাতর জায়গাগুলো স্পর্শ করিনি। স্বাভাবিক কারণে এল–সিক্স আমার ওপর রাগ করতেই পারে।

আমার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অনড় ছিলাম। মনে প্রাণে বিশ্বাস করি সেক্স এলে আর বন্ধুত্ব থাকে না। চলে আসে প্রেম। প্রেম এলে শরীর আসে। শরীর এলে শারীরিক সম্পর্ক চলে আসে।

প্রিয় পাঠক–পাঠিকা, অনেকে হয়তো বিশ্বাস করছেন না, তাই না? এতো কাছাকাছি থেকেও কিভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছি। এর উত্তরে বলবো, আমার বিবেক আমাকে দংশন করেছে। আমার মতে, যার ন্যূনতম বিবেক বোধ আছে সে–ই বিবেকের দংশন কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে পারবে, অন্য কেউ নয়।

কয়েক মাস পরের ঘটনা।

আমার অনুরোধের প্রেক্ষিতে এল–সিক্স আমার সঙ্গে দেখা করবে বলেও দেখা করেনি।

পরে যখন দেখা হলো তখন তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বললো, আমি নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়েছিলাম। আপনাকে পাইনি।

আমি নিশ্চিত, এল–সিক্স আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তারপর আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য বললাম, যেখানে দেখা করার কথা ছিল, সেখানে কি ছিল?

তখন সে উত্তর দিতে পারেনি। কেননা সকাল থেকেই সন্ধ্যা পর্যন্ত উক্ত স্থানে একটি বিশেষ জিনিস ছিল।

দিনের পর মাস। মাসের পর মাস এল–সিক্সের সঙ্গে আমার সম্পর্কে অবনতি হচ্ছে। এখন এমন অবস্থা হয়েছে, দেখা তেমন হয় না বললেই চলে। যদিও কদাচিৎ দেখা হয়, কথা হয় না। সবচেয়ে বড় কথা হলো, যার বিবেচনা বোধ কম তার সঙ্গে আর যাই হোক না কেন, বন্ধুত্ব হয় না।

ন্যূনতম ইচ্ছা হচ্ছে না এল–সিক্স সম্পর্কে আর কিছু লিখতে।

নাম ও পূর্ণ ঠিকানা বিহীন, ঢাকা থেকে

সুখানুভূতি

– শামীমা আক্তার শ্যামলী

আমার বয়স সাতাশ। বর্তমানে একটি বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত আছি। বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে আব্বা–মা খুব ভাবনায় আছেন। যেহেতু একমাত্র ছোট বোন নিজের পছন্দে অনেক আগেই বিয়ে করে ফেলেছে, তাই আমি আর ওই রিস্কটা নিতে চাচ্ছি না।

আমরা আব্বা–মায়ের দুটিই সন্তান। তাই তাদের এ সুযোগটা আমার দেয়া উচিত বলে মনে করি।

জীবনে অনেকবার অনেকভাবে প্রেম উকিঝুকি মেরেছে। কিন্তু তাতে গা লাগাইনি। কঠোরভাবে এড়িয়ে গিয়েছি। সত্যি বলতে কি, সাহাসও হয়নি।

আমি যোগ্যতায় কোনো অংশে কম না হলেও দেখতে তেমন সুন্দরী নই। ব্যক্তিত্বের কারণেই হোক আর সহজে সবাইকে আপন করে নেয়ার ক্ষমতার কারণেই হোক, পরিচিত মহলে মোটামুটি জনপ্রিয়তা রয়েছে। চেহারায় হয়তো একটু মুডি ভাব বলে প্রথমেই যে কেউ যেকোনো কথা বলে ফেলতে সাহস পায় না। এমনিতে একটু শান্ত প্রকৃতির মেয়ে আমি।

প্রায় বছর খানেক আগে আমার সঙ্গে পরিচয় ফিরোজ-ভাইয়ের। মাঝখানে অনেক দিন কোনো খোজখবর নেই। যদিও তার সেলুলার-এর নাম্বার আমাকে দিয়েছিল। তবুও আগ বাড়িয়ে ফোন করতে মনটা সায় দেয়নি। কি জানি কি ভেবে বসে! কারণ আমার ধারণা, সেও যথেষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী। নিজেকে কারো কাছে হালকা করতে ইচ্ছা হয় না। কয়েক দিন আগে ১৩ ডিসেম্বর তার সঙ্গে কথা হলো তারই আগ্রহে। কারণ যার মাধ্যমে পরিচয় তাকে বলেছিলেন, ওর সেলুলার ফোনে যেন কথা বলিয়ে দেয়।

প্রায় আধা ঘণ্টা কথা হলো। হঠাৎই মনে হলো দেখি না একটু দুষ্টুমি করে! কথার এক পর্যায়ে বললাম, উইল ইউ বি মাই ফ্রেন্ড?

তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে না পারায় দ্বিতীয়বার বলার পর হ্যা বললেন।

সৌজন্য বোধ থেকে ১৫ তারিখ ফোন করলাম।

তারপর থেকে ১৮, ১৯, ২০ তারিখ প্রতিদিন কথা হচ্ছে। হয় তিনি করছেন, না হয় আমি। নিজের ব্যক্তিত্বকে ধরে রাখতে প্রায় প্রতিদিন ভাবছি নিজ থেকে ফোন করবো না। কিন্তু আমি না করলে কি হবে তিনি তো করছেন। কথাও হচ্ছে।

যেদিন অফিস ছুটি সেদিন আমি ফোন করছি। এ এক নিষিদ্ধ নেশায় পেয়ে বসেছে আমাকে। তাকে অনুভব করছি প্রতিটি স্পন্দনে। সারাক্ষণ যতো কাজেই থাকি না কেন শুধু এই ভাবনা। কি হলো আমার?

তার সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানি না ভালোভাবে। তিনি হয়তো আমার সম্বন্ধে কিছুটা জানেন। তবে কথা বললে খুব আপন এবং কাছের মানুষ বলে মনে হয়।

যে আমি বছরের কয়েকদিন ডায়রির পাতায় দুই চার লাইন লিখতাম, বিশেষ করে মন খারাপ থাকলে বা বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটলে সেই আমি কি না এখন প্রতিদিন এইসব ফোন আলাপ সম্পর্কে লিখে প্রত্যেক দিনের পাতায় স্থান সংকুলান হয় না। প্রতিদিন লিখছি। রাত জেগে লিখছি, ভাবছি, গান শুনছি।

প্রতি রাতে অভ্যাস মতো শুয়ে শুয়ে কিছু একটা পড়তে পড়তে একটু পরেই বেডসুইচ অফ করেই টানা ঘুম। কিন্তু এখন রাতের যেকোনো সময় জেগে যাই এবং জেগেই তার কথা ভাবছি। এর পরিণতি সম্পর্কে ভাবছি।

আমরা সেলুলার ফোনে হ্যান্ডশেক করছি যেদিনই কথা হয় সেদিনই। এপাশ থেকে সেট-এ আমি হাত রাখি, ওপাশে তিনিও তার সেটে ডান হাত রাখেন। পৃথিবীর আর কেউ এমনভাবে কারো হাত ছুয়েছে কি না জানি না। সাবলীল ভাষায় কৃত্রিমতা ছাড়াই দুজন কথা বলি। মনে হয় কতো যুগের চেনা। একদিন যোগাযোগ না হলেই দুশ্চিন্তায় অস্থির লাগে।

Happy New Year 2005–এর কার্ড পাঠিয়ে মজা করে বললাম, কার্ড পাঠিয়েছি। বলেন তো কিসের কার্ড হতে পারে? তিনি বললেন, (উভয়েই আমরা আপনি করে বলি) Happy New Year Card।

বললাম, না, বিয়ের কার্ড। তিনি তো অবাক! একেবারেই অপ্রত্যাশিত মনে হলো তার কাছে। কিন্তু মুখে বললেন না।

কবে কার সঙ্গে প্রশ্ন করতেই বললাম কার্ডেই সব লেখা আছে। আসবেন তো?

১ জানুয়ারি আমাদের বাড়ি পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আসবে বলেছেন।

আমার অপেক্ষার দিন ফুরাতে চাচ্ছে না। একা একা ভাবতে ভাবতে সময় চলে যায় অনেক। কোনো টিভি সিরিয়াল, প্রিয় হিন্দি মুভিতে মন বসে না। উপন্যাসের পাতায় মন বসে না। অবসরে টুকটাক যেটুকু কাজ করি, তাতেও মন বসাতে পারছি না। প্রকৃতি কি আমার সব রুটিন মাফিক চিন্তা ভাবনাকে উলোট পালোট করে দিচ্ছে? বুঝতে পারছি না।

মনের অবস্থা সদ্য কিশোরীর মতো। সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না। তিনি এখন পর্যন্ত প্রেম নিবেদন জাতীয় কিছু বলেননি। আমার এমন হচ্ছে কেন? আমি তো এমন না! সহজে গলে যাবার পাত্রী না। তাহলে কি প্রেমে পড়েছি, নাকি প্রেমে পড়তে যাচ্ছি!

হঠাৎ বান্ধবীর বাসায় শাড়ি পরে বেড়াতে গেলাম। ফেরার পথে ফোন করলাম। জানালাম আপনার কালার শাড়ি পড়েছি।

বললেন, ফিরোজা কালার? হাসলেন।

বরিশালে বেড়াতে গিয়েছেন। দুই বছর বয়সী ছোট খালাতো ভাই বুকে কামড় দিয়েছে।

শুনে বললাম ওই বাবুটাকে আমার পক্ষ থেকে ওর গালে স্পেশাল আদর করে দিতে।

তিনি হেসে একাকার আমার কথা শুনে।

আসলে সেই ব্যথা লাগা লোমশ বুকটা আমার ছুয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে খুব। তাতো আর বলা যায় না! জানি না তার মনোভাবটা কি? দুজনই সমান্তরাল চলছি বোধহয়। মেয়েদের Sixth sense নাকি কড়া।

আমার মনে হচ্ছে তিনিও আমার মতো ভাবেন। কিন্তু কেউ কাউকে *নাহি দেবো ধরা*।

যদি তাই হয়, আমার বিশাল হৃদয়ের সবটুকু লাল গোলাপময় সৌরভ ভরা ভালোবাসা তাকে দেয়ার জন্য আমি প্রস্তুত। শুধু তিনি বলুন Be my Valentine...। সেই পবিত্র মুহূর্তটির অপেক্ষায়।

ফুরশাইল, মুন্সীগঞ্জ থেকে

ব্ল্যাক ডায়মন্ড

– মোহাম্মদ ভুতউদ্দিন সরকার

মেয়েটি কুমিল্লার পিডিবি কলোনির বাসিন্দা। নাম জানা সম্ভব হয়নি। তবে তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে বহুবার। তার বাসায়ও গিয়েছি। আপ্যায়ন করেছে যথেষ্ট। তার ব্যবহারে আমি মুগ্ধ। আমার বিশ্বাস, ভালো ব্যবহারের জন্য সে অতুলনীয়। ছাত্রী হিসেবেও সে যথেষ্ট মেধাবী। দেখতে যথেষ্ট মায়াবতী।

তার সঙ্গে আমার কথা হলেই আমার মায়ের খবর নেবে। আর সে জন্যই বোধহয় তাকে আমার এতো ভালো লাগে।

ফোনে কথা বলার সময় অনেক সময় মনে হয় সে আমার স্নেহের ছোট বোন। আবার অনেক সময় যখন চিটাগাংয়ের ভাষায় কথা বলে, মনে হয় হৃদয় নিংড়ে ভালোবাসি। সত্যি সত্যিই কনফিউশনে আছি।

আমার নাম না জানা পরিচিতার বাবাকে আমি চিনি অনেক দিন আগে থেকে। সত্যিই তিনি একজন ভালো লোকের প্রতিচ্ছবি। সততা ভদ্রলোকের অন্যতম গুণ। ওনার মেয়ে আর সে জন্যই বোধহয় সে এতো ভালো এবং ভদ্র।

তার যে গুণটি আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে তা হলো তার কণ্ঠ। কি বলবো? কোকিল কণ্ঠি বলতে যা বোঝায়।

চিটাগাংয়ের ভাষায় কথা বলা শুনতে সত্যিই অপূর্ব লাগে। তার ব্যবহারে আছে যথেষ্ট সৌজন্যতা আর রুচিবোধ।

একদিন তার বাসায় গিয়ে তার আন্তরিকভাবে বানানো চা খেয়ে আমার মনে হয়েছে সে টি স্পেশালিস্ট। আসল কথা হলো, এতো কিছুর পরও তার নামটি জানা যায়নি। নাম বলার প্রশ্নে সব সময় সে রহস্যময়।

কিন্তু তার নাম জানার আর প্রয়োজন নেই। তার নাম আমি দিয়ে দিয়েছি ব্ল্যাক ডায়মন্ড। ব্ল্যাক ডায়মন্ড কখনো দেখিনি। আর দেখার দরকারও নেই। সেই সত্যিকারের ব্ল্যাক ডায়মন্ড।

আশা করি পিডিবি-র নাম না জানা মেয়েটি লেখাটি পড়ে আশ্চর্য হবে না।

ঠিকানা বিহীন

হৃদয় থেকে নেয়া

– খন্দকার নাফিস আহমাদ বাঁধন

এ এক ব্যর্থ প্রেমিকের আত্মকাহিনী। হ্যা ব্যর্থ। ব্যর্থই তো! আজ থেকে দশ বছর আগে শীলার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। তখন আমি ছোট। পড়াশোনা করি না বললেই চলে। ছোট্ট মন, ছোট্ট আসা। সে ভালো-মন্দ বোঝে না, বোঝে শুধু হাসি-খেলা ও বন্ধুত্ব। হ্যা বন্ধুত্ব। বন্ধুত্ব থেকেই শুরু। তা কখন ভালোবাসা হলো আমি জানি না। বুঝিওনি, বুঝতে চাইওনি। শীলা প্রথম আমায় বলে।

আমাদের কাছে তা ছিল গভীর বন্ধুত্বের প্রতীক। আর কিছু নয়।

তার সেই আকুল চাহনি। সেই দুষ্টু চোখ। তার দুষ্টু দুষ্টু কথা। আমাকে তার দিকে আকৃষ্ট করে।

আমাকে জানার তার অদম্য ইচ্ছা। আর আমাকে নিয়ে ভাবনা। তাকে নিয়ে আমাকে ভাবতে শেখায়। ভালো লাগাতে শেখায়।

জানতেও পারিনি কখন মনের ভেতরে সেই ভালো লাগা! তার প্রতি সেই মমত্ব বোধ আমায় ভালোবাসতে শেখায়।

আমরা তখন তালাইমারি নামের এক আবাসিক এলাকায় থাকতাম। এর আগের বাসায় চার বছর থাকার পর আমরা বাড়ি বদলাই। তালাইমারি কিছুটা শহুরে। তাই বাবা তিন তলায় ভাড়া নেন এবং বাবার অফিস কাছে হবে এটাও একটা কারণ।

আমার সঙ্গে শীলার প্রথম দেখা হয় যখন শিমুলভাইয়াদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলে ফিরছি। আমি খেলতে জানতাম না। শিমুলভাইয়াদের খেলা দেখছিলাম। ব্যাটে-বলে সংযোগ লেগে বল আমার ঘাড়ে এসে লাগে। বলটি ছিল মারতি বল।

যাহোক তারা আমায় ধরে বাসা নিয়ে এসেছিলেন।

শীলারা থাকতো শিমুলভাইয়াদের বাসার দোতলায়। আমাদের পাশে তারা থাকতো।

আমাদের বাসাটি ছিল এক তলা। শীলা নিচে খেলছিল।

ও আমার এ অবস্থা দেখে বললো, ওর কি হয়েছে?

শিমুলভাই বললেন, কেন? তাতে তোমার কি?

সে হাসলো। পরক্ষণে আমার দিকে কেমন যেন আনমনা হয়ে তাকিয়ে থাকলো এবং বললো, তোমার নাম কি?

বললাম। এবার জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কি?

সেও বললো।

বললাম, চলো খেলি।

সে বললো, না। আগে তুমি বলো, বন্ধু হবে?

বললাম, হ্যা হবো।

আমরা বন্ধু হলাম।

এরপর আমরা সেখানে ছিলাম ছয় মাস। এই ছয় মাসে আমরা হয়ে উঠলাম অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে বন্ধুত্ব ছিল প্রকৃতই মনের।

সন্ধ্যায় মাকে বলার পর ওদের ছাদে শুকতারা দেখতে যাওয়া। বর্ষার পানিতে নেচে-গেয়ে গোসল করা যেন নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে গেল।

সে আমাদের বাসায় আসতো।

আবার সময় করে আমিও ওদের বাসায় যেতাম।

বিকেলে তার সঙ্গে হাড়ি-পাতিল খেলা ও পুতুল বিয়ে খেলতাম। জানিও না আসলে কখন তাকে ভালোবেসেছি। হয়তো প্রথম দিনেই। হয়তো গোধুলীবেলায় যখন ছাদে তারা গুণতাম তখন। নিজেও জানি না কখন সে আমার এতো কাছের ও এতো আপন হয়েছিল! হয়তো যখন বর্ষার পানিতে গোসল করতাম, একে অন্যের দিকে তাকাতাম তখন। আমিই বুঝতে পারিনি কখন।

এতোটুকু জানি আর তা হলো এই যে, ও আমার হৃদয়ের এক কোণে স্থান করে নিয়েছে। শুধু এটা জানি, ও আমার শয়নে, স্বপনে, জাগরণে আমার প্রতেকটা নিশ্বাসের সঙ্গে মিশে আছে।

না। আমার কাছে তার কোনো ছবি নেই, নেই ঠিকানা।

বড় হয়ে তাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়ে ওঠেনি। জানি না তার সঙ্গে আমার দেখা হবে কি না। জানি না সে আমায় আগের মতো ভালোবাসে কি না। জানি না আমি যেমন করে তাকে চাই, সে চায়

কি না। জানি না তাকে নিয়ে যতোটা ভাবি, সেও ঠিক ততোটা ভাবে কি না। জানি না আর জানতে চাইও না।

তাকে ভালোবাসি। তাই বলে তাকেও ভালোবাসতে হবে এর কোনো মানে নেই। আমি তা মনে করি না যে, সেও আমায় ভালোবাসতে বাধ্য। তার নিজের পছন্দ থাকতে পারে। থাকুক। আমি শুধু তাকে ভালোবাসি। শুধু তাকে। এবং সারা জীবন বাসবো ইনশাআল্লাহ।

আমার কথাগুলো যতোটা না আবেগের তারচেয়ে বেশি মনের।

আত্মার ভালোবাসায় বিশ্বাস করি, মনের ভালোবাসা বেশি বড়। তা জীবনভর স্থায়ী হয়ে থাকে। দেহ আমার কাছে মুখ্য নয়। আমার মতে, তা একটা উপলক্ষ মাত্র আর কিছু না। ভালোবাসায় মন আসল। আমি জানি, ও যদি আমায় ভালো না বাসে তাহলে একতরফা ভালোবাসা অন্যায়। কিন্তু তা মনে করি না। কারণ ভালোবাসা আগে-পিছের কিছু ভাবে না। সে শুধু সুখ-দুঃখ ভাগ করতে জানে।

আকাশ-বাতাস থেকে শুরু করে প্রকৃতির সর্বত্র তাকে খুজে পাই। তার কোনো ছবি আমার কাছে নেই তা আগেই বলেছি। আমার মতে, মনের কল্পনাই ভালোবাসার আসল ভূমিকা লালন করে।

যাহোক পুরনো দিনের সেই অতি প্রিয় ও একমাত্র বন্ধুকে বা বান্ধবীকে যাই বলুন, আজও আমার মনে পড়ে। তাকে আজও ভুলতে পারিনি। হয়তো যখন এসব লিখছি তখন সে আমায় নিয়ে ভাবছে। হয়তো আমার লেখা পড়ছে। হয়তো তার বন্ধুকে মনে পড়ছে তার। হয়তো সেও আমায়! না হয়তো তা দুরাশা। আবার আশাও হতে পারে।

আশা ও নিরাশার মাঝখানে বিশ্বাস অবস্থান করে। সেই বিশ্বাসকে অবলম্বন করে শেষ করলাম। আল্লাহ হাফেজ।

তিস্তা কটেজ, মীর্জাপুর, রাজশাহী থেকে

ভাইয়া

– রুবাইয়া

ভালোবাসা কি সেটা প্রথম বুঝি ভাইয়ার কাছ থেকে। ছোটবেলা থেকেই ভাইয়া ছিল আমার একমাত্র বন্ধু। আমাকে এতো আদর করতো ভাইয়া যে, ভাইয়া ছিল একদিকে আর পুরো পৃথিবী ছিল আরেকদিকে। ভাইয়া হাত ধরে জীবন চিনিয়েছিল আমাকে। পড়ালেখা থেকে শুরু করে, কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ সব কিছুরই শিক্ষক ছিলেন ভাইয়া।

ভাইয়া সব সময় বলতেন, আমার বোন হবে সবার চেয়ে আলাদা।

এতো আদর দেখে বাবা-মাও মাঝে মধ্যে বিরক্ত হতেন।

বাইরের শক্ত পৃথিবীর আচ থেকে ভাইয়া সব সময় আগলে রাখতেন আমাকে। কেউ বকলে বা অপমান করলে পরম আশ্রয় ছিল ভাইয়া।

ভাইয়া যখন চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বলতেন, কে, কি বলেছে? নামটা শুধু আমাকে বল?

তখনই সব অপমান ধুয়েমুছে যেতো। এতো আদর সত্ত্বেও নষ্ট হয়ে যাইনি। সব সময় ভাইয়ার মুখ উজ্জ্বল করে চলতাম। খুব চমৎকারভাবে কেটে যাচ্ছিল আমাদের দিনগুলো।

এক সময় পরিবারের সবাই ঠিক করলো, ভাইয়ার বিয়ে দেয়া দরকার।

খুব চমৎকার, মিষ্টি একটি মেয়ে ভাবী হয়ে এলেন আমার। ভেবেছিলাম ভাবীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক হবে ভাইয়ার চেয়েও গভীর। কিন্তু খুবই অবাক ব্যাপার, প্রথম থেকেই ভাবী আমাকে খুব অপছন্দ করলেন। জানি না কারণটা কি? তারপর থেকে প্রতি মুহূর্তে ভাইয়া চলে যেতে লাগলেন দূরে, আরো দূরে।

ওরা এখন কানাডায় আছে। আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাই যে, আমার মনকে অন্তত বলতে পারি, ভাইয়ার সঙ্গে দূরত্বটা আসলে জায়গার, সময়ের। আমার আর ভাইয়ার হৃদয়ের মাঝে আসলে কোনো দূরত্ব নেই।

একটা সম্পর্ক কখন শেষ হয়ে যায়? কেউ যখন কাউকে মিস করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। তখনই আসলে সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়, মরে যায়। He doesn't miss me anymore. So, what should I say to him? Good bye? But I miss him so much.

কিন্তু শুধু দুটো হাত দিয়ে কি কাউকে ধরে রাখা যায়? চারটা হাত দরকার, তাই না? I lost him. হারাতে ভালো লাগে না। মন খারাপ হয়, কান্না পায়। তারপরও হারাতে হয়, প্রিয় মানুষ, প্রিয় সময়, প্রিয় সম্পর্ক।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

আমার রাজকুমার

প্রহর শেষের রাঙা আলোয় সেদিন চৈত্র মাস
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ

জানি না সেদিন চৈত্র মাস ছিল কি না। তবে আমার যে সর্বনাশ হয়েছে তার চোখে চোখ রেখে তা অনেক দেরিতে বুঝেছি। *আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান।*

তার সঙ্গে আমার পরিচয় সেই আঠারো বছর আগে। আমারও বিয়ে হয়। আমার স্বামীর কর্মস্থলে তারও আসা হয়। আমার স্বামী খুব সোজা সরল। সে তার নিজস্ব জগৎ, তার অফিস আদালত নিয়েই ব্যস্ত। একটা মেয়ের বিয়ের পর সে যে কতো একা থাকে, স্বামীর সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায় সব কিছু, সে তার কিছুই জানে না। জানে না কিভাবে একটা মেয়েকে কাছে পেতে হয়। কিভাবে তাকে আদর সোহাগে ভরে দিতে হয়। সে তার কোনো কিছুই জানতো না। শুধু জানতো তার অফিস।

এদিকে আমার রাজকুমার ছিল। সবার সঙ্গে অবাধ মেলামেশা। তখনো সে বিয়ে করেনি। তার সঙ্গে আমার ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব হয়। বুঝতে পারি তার প্রতি দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। এবং সেও আমাকে ভীষণ পছন্দ করতো। আমি প্রথম থেকেই পছন্দ করলেও তাকে দূরে সরিয়ে রাখতাম। চাইতাম আমার স্বামীর সঙ্গে আমার আরো মিল হোক, যেকোন জায়গায় তাকে আশা করতাম। কিন্তু আমার স্বামীটি বড় বেশি অফিস পাগল যে, সে আমাকে কোনো সময় দিতে নারাজ।

এভাবে চার বছর কেটে গেল। ওদিকে আমার বন্ধুর সঙ্গে তখনো তেমন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি। তবে আমরা দুজন দুজনকে ভীষণ পছন্দ করতাম।

একদিন সে বিয়ে করলো। কোনো কারণবশত তাদের পারিবারিক জীবন অশান্তির ছিল।

এভাবে আমরা। উভয় পরিবার একই জায়গায় থাকতাম বিধায় ধীরে ধীরে আমাদের মেলামেশা এতো কাছের হলো যে, আমাদের দুটি দেহ এক হলো, এক হলো মন।

একে অপরকে ভালোবাসতাম। কিন্তু কেউ কাউকে অতোটুকু বুঝতে দিতাম না। এভাবে আমাদের দিন যাচ্ছে। উভয় পরিবারের বন্ধুত্ব অটুট রইলো। জানি না সে আমাকে কতোখানি ভালোবেসেছে। তবে আমি যে তাকে ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছি তা আমার চোখের জলই সাক্ষী।

আজ সে নেই। নেই এ সুন্দর পৃথিবীতে যেখানে তাকে খুজে পাবো যে শুধু আছে আমার হৃদয়ে শুধু স্মৃতি হয়ে যখন–তখন তাকে দেখি আনন্দ বেদনার স্মৃতির পাতা খুলে। সে আমার মনের রাজকুমার। মানুষের জীবনে কে কখন বেশি ভালোবাসা কেড়ে নেয় কেউ তা জানে না।

আজ যখন লিখছি তখন তার জন্মদিন। আজ তাকে দেয়ার মতো কিছু নেই। তাকে ভীষণ ভালোবাসি। আমার তৃপ্তি, সুখ যা কিছু তাকে পেয়ে বুঝেছি। তার বিশাল বুকে যে কতো শান্তি ছিল, শুধু আমি জানি। কাউকে আর বন্ধুর হাত বাড়াতে পারি না। এই বয়সেও বন্ধুত্ব করা যায়। তবে সেটা চলে যায় দৈহিক পর্যায়ে। আমি তো সুখ নিতে পারি। কিন্তু না, এখন কিছুই পারি না তার চোখ, মুখ ভেসে উঠে আমার মনের পর্দায়। সে কতো অসহায়, অসহায় এই আমি।

হয়তো সহজে কাছে আসা। তাই কাছে আসি, হয়তো সহজ ভালোবাসা। এ জন্য ভালোবাসি। যখন সহজে কিছু পাই, ভাবি হয়তো সহজ ছিল পাওয়া।

যখন হারাই, ভাবি হায়, এতো সহজে চলে যাওয়া শিখেছে মানুষ সে নেই! যেকোনো ক্ষণে দিনে–রাতে সব সময় যেন আমার সঙ্গেই আছে। তার কথা মনে পড়লে মনের অজান্তেই চোখে জল আসে। মাঝে মধ্যে আমার আট বছরের ছেলে বলে, আম্মু, তোমার চোখে পানি কেন?

আমি বলি, বাবা, মনে হয় কিছু পড়েছে।

সবল সুস্থ মানুষটা এক মাসের রোগে ভুগে চলে গেল। তাকে হেপাটাইটিস–বি ভেতরে ভেতরে শেষ করলো। বুঝলো না সে।

তার শেষ স্পর্শ হোক আমার বেচে থাকার শক্তি।

আমার এক বিন্দু চোখের জল, আমার ভালোবাসার নীরব সাক্ষী...।

তুমি চলে গেছো কেউ নেই
আছে শুধু দুর্ভর দুঃখ
আমি যেখানেই যাই সে আমার
পিছু পিছু ঘোরে, এক কালো ছায়া।

এম আর

পূর্ণ নাম ঠিকানা বিহীন

চট্টগ্রাম থেকে

পাগলি বৌ

– জুয়েল

আমি তাকে ডাকি *পাগলি বৌ* বলে। কিন্তু তার আসল নামটাও ভারী সুন্দর। তার ডাক নাম *মমী*। তার নামের মতো সেও দেখতে ভারী সুন্দর। তার গায়ের রঙ যেন দুধে–আলতা। তার চোখ, তার নাক, তার গাল, তার হাসি, তার ঠোঁট ...। তার সব কিছুই যেন অদ্ভুত সুন্দর। সত্যিই সে অপূর্ব সুন্দরী। যখন সে শাদা জামা পরে তখন তাকে শাদা পরীর মতো লাগে। তাই তো তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি।

তার সঙ্গে আমার দীর্ঘ দিনের পরিচয়। গত দুই তিন বছর ধরে তাকে অংক কষাই। অথচ কখনো তাকে সেই নজরে দেখিনি। এবার সে ২০০৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থিণী। বেশ কিছুদিন আগেও যাকে কখনো বিশেষ নজরে দেখিনি সে এখন আমার ভালোবাসার সঙ্গিণী। তাকে ভালো লাগার বিশেষ কিছু কারণও আছে। সে তো দেখতে অপূর্ব সুন্দরী। তার ওপরে সে প্রচণ্ড চঞ্চল। তার এই চঞ্চলতা আমাকে দারুণভাবে মুগ্ধ করেছে। তার মধ্যে কোনো অহংকার নেই। সে প্রকৃতির মতোই নির্মল ও সুন্দর। এ রকম একটা মেয়েকে ভালোবাসতে পারা যেন ভাগ্যের ব্যাপার।

তার সঙ্গে ভালোবাসা হওয়ার পর্বটা একটু বলি।

একদিন সে খুব সুন্দর করে সেজে তার মায়ের সঙ্গে আমাদের বাসায় বেড়াতে এসেছে। তাদের বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে অল্প কিছু দূরে। সেদিন সে লাল একটা জামা পরেছিল এবং ম্যাচিং, সব কিছু লাল পরেছিল। কেউ বিশ্বাস করবে না সেদিন তাকে অপ্সরীর মতো সুন্দর লাগছিল। আমার কাছে মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে এর চেয়ে সুন্দর মেয়ে থাকতে পারে না! তাকে দেখে আমার মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। সেদিনই তাকে প্রচণ্ড ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

তাকে যখন পরে আস্তে আস্তে আমার ভালো লাগার কথাটা জানালাম সেও আমার মতে সম্মতি জানালো। তার সঙ্গে আমার প্রথম ডেট হয় ১ জানুয়ারি ২০০৫ সালে। অর্থাৎ এই তো সেদিন বিকেলবেলা আমি আর মমী গিয়েছিলাম টি বাধের সেই বালুর চরে। সে কি অদ্ভুত দৃশ্য! ঠাণ্ডার মধ্যেও ঝিরি ঝিরি বাতাস। বাতাসে তার সেই চুল ওড়া, নৌকায় করে ঘুরে বেড়ানো, তার হাতের একটি আঙুল স্পর্শ করা, চটপটি খাওয়া এবং নতুন বছরের নতুন সূর্যের সূর্যাস্তের সঙ্গে ছবি তোলা। অপূর্ব গিয়েছিল সেদিনের সেই বিকেলবেলাটা যেন হাজার বছরের স্মৃতিতে গেথে রাখার মতো একটি বিকেল।

তারপরে এই কোরবানি ঈদে বিকেলবেলায় গিয়েছিলাম তাদের বাসায় মাংস দিতে। দেখি, সবাই কাজে ব্যস্ত। এই ফাকে তার সুন্দর লাল টুকটুকে ঠোঁট দুটোতে একে দিয়েছিলাম আমার ভালোবাসার চিহ্ন। সে কি লজ্জা তার! লজ্জায় তার ফর্শা চেহারাটা লাল হয়ে গিয়েছিল। তার সমস্ত শরীর কাপছিল। অবশ্য তারপরে মমীর কাছে অনেক বকাও খেয়েছি। এখন অবশ্য আর কিছু বলে না।

এবারের ভালোবাসা দিবসে আমাদের দুজনের ভালোবাসা দেড় মাসে পা রাখলো। আমি জানি, আমার ভালোবাসার বয়সটা খুব অল্প। কিন্তু তাতে কি, আমার ভালোবাসা একদিন সার্থক হবেই

হবে। আমি এবার মাস্টার্স পরীক্ষা দিচ্ছি। পড়ালেখা শেষে একটা চাকরির অপেক্ষায় রইলাম। চাকরি পাওয়া মাত্রই বাবা–মাকে রাজি করিয়ে আমার মনের মানুষটিকে সত্যি সত্যিই আমার *পাগলি বৌ* বানাবো।

হাজেরা ভবন, রাজশাহী থেকে

আলোকিত ছয় বছর

– শামীমা ইয়াছমিন

কিছুদিন আগে হঠাৎ জানতে পারলাম তিনি বিয়ে করেছেন।

হঠাৎ এই খবরটা শুনে মনে হলো পৃথিবীর সব কষ্ট যেন আমার এ হৃদয়েই কেউ একে দিল। সব সময় যাকে মনে মনে ভেবেছি সে একান্তই আমার। সব সময় ভাবতাম যদি বিয়ে করি, আপনাকেই করবো। আর আপনিও আমাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবেন না। আমার মনের এতো অহংকার আপনার হাতের একটু (বিয়ের সিগনেচার) স্পর্শে শেষ হয়েছে।

একটু একটু করে আপনাকে ভালোবেসেছিলাম। আপনি থেকে তুমি এবং সেই সঙ্গে আপনার নামটাও মনে মনে মাঝে মধ্যে বলতে শিখেছিলাম। আপনার বিয়ের খবরটা শোনার পর আমার পৃথিবীটাই যেন পাল্টে গেছে। এখন কেন যেন আর মনে মনেও আপনাকে তুমি বলতে পারি না।

এক সময় উচ্ছলভাবে হাসতে, গান গাইতে পারতাম, বান্ধবীদের সঙ্গে গল্পের পর গল্প করতে পারতাম। এখন কেন যেন থমকে যায় আমার হাসি, গল্প বলা, আমার গান।

এক জীবনে মানুষ কতো স্বপ্ন দেখে, কতো কিছু মানুষ চায়, কতো থাকে মানুষের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আমার চাওয়া ছিল শুধুই আপনাকে পাওয়া আর আমার সে চাওয়াটুকুও পাওয়াতে পরিণত হলো না শুধু আপনারই একটু ভুলের জন্যে।

আপনি এখন আর আমার আপন না, এটা আজও মেনে নিতে পারিনি। আজও ভুল করে ভাবি, আপনি আমার চিরদিনের জন্যে আপন হয়েই আছেন। আপনার মুখ, হাসি, ধীর–স্থির কথা বলা, শান্তভাবে হাটা সব এখনো আমার চোখে ভাসে। আমি যেমন কখনো আপনাকে বলিনি ভালোবাসি তেমনি আপনিও আমাকে কখনো বলেননি ভালোবাসি তোমায়।

আমার প্রত্যাশা ছিল আমার হাতে একটি গোলাপ দিয়ে আপনি বলবেন, ভালোবাসি আমি তোমাকে। তা কখনো বলেননি। তারপরও আমরা জানতাম যে, আমরা দুজন দুজনকে কতোটা ভালোবাসতাম।

হাতে হাত রেখে রাস্তায় হাটবো, বৃষ্টিতে ভিজবো দুজন, রাত জেগে জ্যোৎস্না দেখবো আর গল্প করবো। আমার সব স্বপ্ন আপনি এক আচড়েই ভেঙে দিয়েছেন। কি দোষ ছিল আমার যার কারণে আপনাকে পেলাম না? আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে কেন বিয়ে করলেন? এ প্রশ্ন আপনার কাছে আমার সব সময়ের জন্য রইলো।

আপনি আমাকে একবার লিখেছিলেন, হে আমার মানসপ্রিয়া, জানি আমার ভাবনার খেয়া তরী ভেড়াবো তোমার নোঙ্গরে...।

আপনাকে সেই উত্তরটা আমার দেয়া হয়নি। ভেবেছিলাম আমাদের বিয়ের প্রথম রাতে বলবো। যা হয়তো আর কখনো বলা হবে না, আজ তাই বলছি।

প্রিয়, আমার ভাবনার খেয়া তরীও ভাবতে ভাবতে, ভাসতে ভাসতে আপনারই কাছে যেতে চেয়েছিল আপনারই নোঙ্গরে ভিড়বে বলে। বাধবো ছোট একটি নীড়, তাতে থাকবে সুখ আর ভালোবাসা। আমার সেই স্বপ্নের সুখের ঘরে আজ আমি না, ফুটেছে একটি (আপনার বৌ) নীলপদ্ম।

আপনার সঙ্গে কথা বলেছি অনেক। তবে হয়তো আর সেভাবে কখনো কথা বলা হবে না। তাই সেই কথাটি বলছি। আপনি আমাকে ভালোই যখন বাসলেন, আরোও একটু বেশি ভালোবাসতে পারলেন না? তাহলে যেমন আপনাকে জয় করতে পারতাম তেমনি আপনিও জয় করতে পারতেন আমাকে। আপনাকে হারিয়ে সত্যিই কষ্ট পেয়েছি। তবে আমাদের দুজনের অতীত সে দিনগুলো ভেবে সুখও কম পাই না।

আমার সব ভালো লাগা, ভালোবাসা, স্বপ্ন শেষ করে আমার জীবনটা আপনি করে দিলেন অন্ধকারময়। তারপরও ছয় বছরে আপনি আমার মাঝে যতো আলো ছড়িয়েছিলেন তা আমার মনের আলো হয়েই থাকবে সব সময়। এরপরও আপনি সুখে থাকুন সব সময় আমি যেমন চাই।

জামালপুর থেকে

ভুল

– রূপা সিংহ

২০০৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ভ্যালেন্টাইনস ডে–তে এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটি এখনো আমাকে হাসায়।

ঘটনাটা যাকে নিয়ে সে আমার মাসির মেয়ে নীলা। ওর একটা বান্ধবী ছিল যার নাম তন্বী। ভ্যালেন্টাইনস ডে–র কয়েকদিন আগে তার বিয়ে হয়েছিল। তাই তাদের অর্থাৎ নীলা ও তন্বীর পরিকল্পনা ছিল তন্বীর স্বামীকে নিয়ে ভ্যালেন্টাইনস ডেটা একটু অন্য রকমভাবে উৎযাপন করবে। তাই ওই দিনটির জন্য নীলার চলছিল বেশ আয়োজন। অর্থাৎ কোন জামা পরবে, কিভাবে সাজবে এই আর কি।

যাই হোক। সেই দিন এসে উপস্থিত হলো। নির্দিষ্ট দিনে ওরা স্বামী–স্ত্রী নীলাদের বাড়িতে বেড়াতে এলো।

আমি মাসির বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমি ও নীলা একই বয়সের হওয়ায় ওরা আমাকেও ওদের সঙ্গে নিল।

প্রথমে আমরা নিউ মার্কেট গেলাম। সেখানে কিছু কেনাকাটা করে ফাস্ট ফুডের দোকানে ঢুকলাম। পেট পুরে খেয়ে বের হলাম। বেরিয়ে দুটো রিকশা ঘন্টা চুক্তিতে ভাড়া করে সারাটা দিনই প্রায়

রিকশায় কাটিয়ে বিকেলের দিকে গিয়ে বসলাম বিএল কলেজের মাঠে। বেশ কিছুক্ষণ গল্প, গুজব, আড্ডা দেয়ার পরই ঘটলো ঘটনাটা।

বেশ বাতাস হচ্ছিল। ফলে নীলার জামাটা বার বার উড়ে যাচ্ছিল। তাই হাত দিয়ে ঠিক করতে করতে ও আবিষ্কার করলো, ও ভুল করে উল্টো জামা পরে চলে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর সুন্দর মুখখানা বিষণ্ন বেদনায় ছেয়ে গেল।

ওর কারণে আর বসে থাকা হলো না। তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলাম।

বাড়ি আসার পথে ওর যা লজ্জা লাগছিল তা বলে বোঝানোর নয়। ঘন ঘন আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, রূপা দেখতো ভালো করে, উল্টো জামা পরেছি তা বোঝা যাচ্ছে কি না?

যতোই বলি বোঝা যাচ্ছে না, কিছুক্ষণ পর পর ওর ওই একই প্রশ্ন।

বাড়িতে আসার পর দাদারা এই ঘটনা শুনে হাসাহাসি ও ক্ষেপাতে শুরু করলো।

এতে ওর আরো মেজাজ গরম হলো এবং এক সময় কেদে দিল।

ওকে বুঝিয়ে কোনো রকমে ঠাণ্ডা করলাম।

জামাটা পৃন্টের হওয়ায় তেমন বোঝা যাচ্ছিল না। তারপরও ওই কথা ভেবে ওর কাছে সারা দিনের আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল বলে মনে হলো।

আমাদের বিএল কলেজের আড্ডার ফাকে এক মোবাইল চা বিক্রেতার কাছ থেকে চা খাবার সময় দেখেছি তাকে নীলার দিকে তাকিয়ে হাসতে। তখন বুঝতে পারিনি চা বিক্রেতা হাসে কেন? পরে যখন বুঝলাম তখন আমিও আর না হেসে পারলাম না।

তাই আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ করবো, যতো ব্যস্ততাই থাকুক না কেন, অন্তত বাইরে বের হবার সময় ভালোভাবে নিজেকে একবার আয়নায় দেখে নিন, বিশেষ করে জামা, জুতা ইত্যাদির দিকে একটু বাড়তি নজর দেবেন।

ছোট বয়রা, পূজাখোলা, খুলনা থেকে

কেন

এহসান, কেন তুমি এমন করলে? কি মিললো তোমার এসব করে? গত কয়েকদিনে হাজারবার মনে মনে এ প্রশ্নই করেছি। কেন করলে তুমি এমন?

এহসান, তোমাকে আর বিশ্বাস করতে পারছি না। কিভাবে করবো বলো? সব কিছুর পরে আমার সবচেয়ে বড় কষ্টটা কি জানো? তুমিও টিপিকাল অন্য আট দশটা ছেলের মতোই, আলাদা কিছু না। অথচ আমার দেখা অন্য সব ছেলের চেয়ে তুমিই আমার কাছে আলাদা ছিলে। খাটি ছিলে। সরাসরি কথা বলতে। তোমার অনেক কথাতে কষ্ট পেয়েছি। তবুও আমার ভালো লাগতো এই ভেবে যে, তুমি অন্যদের মতো না। যা বলার সরাসরিই বলতে। তাই তোমার কথা অকপটে বিশ্বাস করতাম। সবাই বলে, ইন্টারনেটের কোনো মানুষই ঠিক না। কেউ সঠিক ইনফর্মেশন দেয় না। কাউকে বিশ্বাস করিনি। কেউ চ্যাটিংয়ের কুফলের কথা বললেই আমি তোমার উদাহরণ দিতাম। এমনকি আমার ফ্রেন্ডরাও দিতো। আর তুমি? এক নিমিষে সব শেষ করে দিয়েছো। সব নষ্ট করে ফেলেছো।

এহসান, তুমি বোকা না। বোকা আমিও না। আমি তোমার প্রতি দুর্বল এটা তুমি জানতে। খুব ভালো করেই জানতে। শুধু বন্ধু হলে সপ্তাহে অন্তত দুবার কেউ ফোন করে না। ফ্যামিলির খোজ নিতো না। আমার মনের ভেতরে যে কি চলছে, কি যে চলছে ভেতরে! অন্য কারো মতো বোঝাতে পারি না। কাদতেও না। শুধু ভেতরটা আমার পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

তোমাকে সব সময় প্রশ্ন করতাম, বিয়ে কখন করবে? সব সময়ই বলেছো, তোমার মা বলেছেন তোমাকে মেয়ে দেখতে, তুমি বলেছো মাকে মেয়ে দেখতে। অথচ আজ নয় মাস পর তুমি বলছো, তোমার জন্য মেয়ে ঠিক করাই আছে? কেন?

ওই দিন বললে, আমি নাকি বেশ সহজ সরল। যদিও বলেছিলাম, আমি মোটেও তা না। এ আমার মধ্যেই মাঝে মধ্যে আমাকে স্তম্ভিত ও লজ্জিত করে দিয়ে কতো কুটিল, জটিল চিন্তা কাজ করে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, না, আমি আসলেই সরল। সরল না হই অন্তত শুদ্ধ। আমি সরল বলেই তুমি পেরেছো এ খেলাটা খেলতে।

তুমি আমাকে চিনতে না। আমিও না। চ্যাট-এর মাধ্যমে আমাদের পরিচয়। কিন্তু আমি কখনোই তোমার কাছে মিথ্যাচার করিনি। আমি যেমন, যা আমার ফ্যামিলি কনডিশন ঠিক সেভাবেই নিজেকে তুলে ধরেছি। কখনো বাড়িয়ে কিছু বলিনি। এখনো পারতপক্ষে তোমার সঙ্গে রাগ দেখাইনি। রাগ হলেও না। কারণ তুমি তোমার ফ্যামিলির ব্যাপারগুলো আমাকে বলেছো। তোমার ভাই, বাবা, সৎমা, এমনকি রাতে তোমার কাছে কেউ আসে। তাও। সবই বলেছিলে।

বলেছিলে খেলাটাকে উপভোগ্য করতে, তাই না?

এহসান, তুমি জানো না, তুমি আমার শেষ করেছো কতোটুকু? তুমি সেটা জানো না। জানবেও না। কিন্তু তুমি এটা তো জানতে কেমন ফ্যামিলির মেয়ে আমি! আমার মা-বাবার দ্বন্দ্ব, আমার গভীর একাকীত্ব, কষ্ট, সবই তো তুমি জানতে। তাহলে আমাকেই কেন বেছে নিলে খেলার উপকরণ হিসেবে? তোমার তো অনলাইন ফ্রেন্ডের অভাব নেই। তোমার মতো আমিও তো এক হিসেবে ব্রোকেন ফ্যামিলির মেয়ে। তবে আমার সঙ্গেই কি খেলাটা খেলা জরুরি ছিল?

তুমিই তো বলতে, আমি খুব বেশি সেন্টিমেন্টাল। তাই দিলে এ কষ্টটা? এহসান, তুমি আমার কাছে অনেক ছোট হয়ে গেলে। অনেক ছোট যেটা কখনোই চাইনি। আমার মোস্ট রেসপেকটেবল পার্সনটা আমার সামনে ছোট হয়ে যাক এ কখনোই চাইনি। ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে আমার প্রেম না হোক, ফ্রেন্ডশিপ তো থাকতে পারতো, তাই না? আমি কাউকে চাই তার মানে এই তো না যে, সেও আমাকে চাইতে হবে। তাছাড়া আমি এমন কিছু নই যে, আমাকে কালো ভালোবাসতেই হবে। তাহলে এই ধোকাবাজিটা কেন করলে? কেন নষ্ট করলে সব কিছু? নিজেও নষ্ট হলে!

আমি ভাবতাম তুমি কখনো কোনো মেয়ের সঙ্গে ধোকাবাজি করবে না। কারণ তুমি আমার মাকে খুব শ্রদ্ধা করো। কিন্তু তুমিও অন্য সবার মতোই। মাকে মা হিসেবেই দেখেছো বাবার স্ত্রী হিসেবে। একজন মেয়ে হিসেবে তার চাওয়া পাওয়া দেখতে পারোনি। আসলে কোনো ছেলেই বোধহয় পারে না, তাই না? তোমাকে একবার বলেছিলাম, আমি একটু সেকেলে টাইপ। তুমি বলেছিলে, কেন তা হতে যাবে? হ্যা, আমি তাই। নয় মাস ধরে একজনের সঙ্গে দেখা করবো যে বয়সে আমার বড়, যার কোনো সম্পর্ক নেই, আমারও না, যাকে সব সময় ফোন করবো, মেইল করবো, ডেট ফিক্সড করে

দেখা করবো। তারপর বলবো, জাস্ট ফ্রেন্ডশিপ, তোমাদের এই তথাকথিত স্মার্টনেস এখনো আমি আয়ত্ব করতে পারিনি।

তোমার কাছে শতকরা একশ ভাগ অনেস্ট থাকতে চেয়েছি। আমার আগের জীবন ঘটনা বিহীন নয়। ভালোবাসার নামে আমি বার বার মরীচিকার পেছনে ছুটেছি। তোমাকে সবই বলতাম। এমনকি হাসানের কথাও যাকে সত্যিই ভালোবেসেছিলাম, যার কথা আমার গুটিকতোক ফ্রেন্ড ছাড়া কেউই জানে না এবং ডিসিশন নিয়েছিলাম, যার কথা কখনো কাউকে বলবো না। তাও তুমি ওই দিন বললে, সবাই আর তুমি কি এক? না আলাদা। আলাদা বলেই এখন *কুত্তা* শব্দটা অন্য কাউকে বলি না। মুদ্রাদোষ বলে বার বার মুখে এলেও গিয়ে ফেলি। তুমি সন্ধ্যায় বাইরে থাকা পছন্দ করো না বলে তা ছেড়েছি। অথচ আগে মন খারাপ হলেই একা রিকশা করে ঘুরতাম। মাথায় কাপড় দিতে বলেছো বলে তাও শুরু করেছিলাম। এসবের বিনিময়ে তুমি কি দিলে?

ডায়রিটা প্রথম থেকে পড়লে বুঝি কিভাবে আস্তে আস্তে আমার ভুবন তুমিময় হয়ে গেছে। প্রথম যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা হলো তা লিখিনি। যদিও জীবনে প্রথম কোনো নেটফ্রেন্ড–এর সঙ্গে দেখা। তবুও পরে প্রতিটি ফোনের কথা পর্যন্ত লিখেছি।

রাতে আমার প্রায়ই ঘুম ভাঙতো। আমি ভাবতাম তোমার কথা। কি পরম নির্ভরে অনির্ভর সম্পর্ক গড়েছিলাম। কেমন শূন্য অনুভূতি আমার। এ শূন্যতার ভারেই মনে হচ্ছে মরে যাবো।

এহসান, কেন করলে এমন? এখনকার শতকরা নিরানব্বই ভাগ ছেলেই ধোকাবাজ। বাকি এক ভাগের খোজ সব সময় করেছি। আমার নিজস্ব কিছু নীতি আছে। বাজে কিছু করি না, বাজে কিছু দেখি না, এমনকি এখনকার রিমিক্স গান পর্যন্ত না। ইউনিভার্সিটিতে ছেলেমেয়েরা কতো আজেবাজে ফাজলামি করে। সযতনে নিজেকে এসব থেকে বাচিয়ে রেখেছি। আমার এসব নীতি বোধের বিনিময়ে একটা ভালো ছেলে কি আশা করতে পারি না যাকে স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করা যায়, ফ্যামিলির সঙ্গে পরিচয় করানো যায়? আমি তোমাকে সেই শতকরা এক ভাগের মধ্যে ভেবেছিলাম।

আমার হাজার কষ্ট হলেও তোমাকে সাপোর্ট দিতে চেষ্টা করেছি। তোমার মন খারাপ থাকলে নিজের মনের কথা কখনো বলিনি। কারণ আমার মনে হয় না আমি অকৃতজ্ঞ। আমার খুব কঠিন একটা সময়ে তুমি আমাকে সঙ্গ দিয়েছো। বিষণ্নতা থেকে টেনে তুলেছো। এ আমি কিভাবে ভুলি! কিন্তু আমি খুব বেশি মহৎও না। তাই তোমাকে মাপও করতে পারবো না। জীবনে যতো সম্মানই তুমি পাও, মনে রেখো একজন সারা জীবন তোমাকে অবজ্ঞার চোখে, ঘৃণার চোখে দেখবে।

এহসান, কেন করলে এমন? জানো, এতো কিছুর পরেও এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না। কারণ এই তোমাকে বিশ্বাস করলে নয় মাসের চেনা সেই জেন্টল, পোলাইট, বিশ্বাসী, সচেতন, আত্মপ্রত্যয়ী এহসান এক নিমেষে মিথ্যা হয়ে যায়। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? কাকে বিশ্বাস করবো আমি?

কেন তুমি এসেছিলে আমার জীবনে?

নাম ঠিকানা বিহীন
nilmukti@yahoo.com

অবহেলায়

– ফারুক

এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করার পর ঢাকায় চলে এলাম কমপিউটার ডিপ্লোমা করার জন্য। প্রথমে ঢাকায় উঠলাম আমার চাচার বাসায়। কিছু দিন সেখানে থেকে মেস খুজলাম। মোহাম্মদপুর একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে কয়েকজন বন্ধু মিলে মেস করে থাকতে শুরু করলাম। ভালোই যাচ্ছিল দিনগুলো। হঠাৎ একদিন পাশের বিল্ডিংয়ের দিকে বন্ধুদের চোখ গেল। সবাই বলাবলি করছিল চোখ সুন্দর, নাক সুন্দর ইত্যাদি।

তাদের কথায় কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি?

তারা জানালা দিয়ে দেখালো পাশের বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলার একটি মেয়েকে। বারান্দায় বসে পড়ছিল সে।

দেখলাম এবং ভালোই লাগলো।

বেশ কিছু দিন তাকে লক্ষ্য করলাম। প্রচণ্ড চঞ্চল মেয়েটি।

আশপাশের সকল বিল্ডিংয়ের ছেলেদের সঙ্গে দুষ্টামি করতো। তার দুষ্টামির প্রধান অস্ত্র ছিল তার ছোট ভাইয়ের খেলনা বন্দুকটি। বন্দুকটি দিয়ে বিভিন্নজনকে গুলি করে দৌড়ে ঘরে চলে যেতো। ছোট মেয়েটির এসব দুষ্টামি আমার খুব ভালো লাগতো।

আমিও একটি বন্দুক কিনলাম। একদিন তার দিকে বন্দুকটি তাক করে গুলি করলাম। যদিও সেটা খেলনা বন্দুক ছিল।

বন্দুকের শব্দে সে আমার রুমের জানালার দিকে তাকালো। আমাকে বন্দুক হাতে দেখে লজ্জায় রুমের ভেতর দৌড়ে চলে গেল।

সেদিনে থেকেই শুরু হলো আমার সঙ্গে দুষ্টামি করা। আমাকে ভেংচি কাটা, গুলি করা ইত্যাদি তার নিত্যদিনের কাজ।

একইভাবে দুষ্টামি করতে শুরু করলাম। একটা দিন তার সঙ্গে দুষ্টামি না করলে ভালো লাগতো না। এরই মধ্যে শুরু হলো হাতের ইশারায় কথা বলা।

হঠাৎ একদিন একটি কাগজে I Love You লিখে তাকে দেখালাম।

খুব হাসলো, মাথা নেড়ে না করলো।

আমিও নাছোড়বান্দা।

এভাবে সকাল থেকে রাত হলো। গভীর রাতে সে হ্যা সূচক মাথা নেড়ে দৌড়ে চলে গেল।

সব বন্ধুরা আমাকে নিয়ে নাচানাচি শুরু করলো। এভাবেই চলছিল দিন।

প্রতিদিন সে তার বারান্দায় এবং আমি আমাদের বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলায় আমার রুমের জানালা দিয়ে কথা বলতাম।

একদিন এলাকার এক ছোট ভাইকে দিয়ে তাকে একটা চিঠি পাঠালাম।

চিঠিটা সে পড়লো না। তার ছোট ভাইয়ের কিছু বন্ধুকে নিয়ে বারান্দায় এলো এবং ছোট ছোট সেই ছেলেগুলোকে দিয়ে আমাকে ঝাড়ু, জুতা দেখলো এবং তারা বললো, কি রে প্রেম করবি? আয় এখানে।

এ ঘটনাটা আমার জন্য এতোটাই কষ্টের ছিল যা প্রকাশ করার মতো নয়। জানালায় পর্দা টাঙিয়ে ঘরে বসে বসে তার সেই দুষ্টামির কথাগুলো মনে করলাম। সব যেন সেই মুহূর্ত থেকে আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেল। আশপাশের কোনো কিছুকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না।

এরপর থেকে সে বারান্দায় এসে আমাকে দেখলে সেখান থেকে সরে যেতো।

তাই আমিও জানালার পাশে যেতাম না। আবার মনটাকেই আটকাতে পারতাম না।

ঈদের ছুটিতে বাড়ি যাবো।

বন্ধুরা বললো, শেষ চেষ্টা কর। একটা চিঠি দে।

তাই করলাম।

এবার সে চিঠিটা পড়লো এবং বারান্দায় এসে হাতের ইশারায় কি যেন বলতে চাইলো।

না দেখার ভান করে সরে এলাম জানালার কাছ থেকে।

সেদিন রাতেই বাড়ি গেলাম। ঈদ শেষে বাড়ি থেকে ফিরলাম।

সে বারান্দায় দাড়িয়ে আবারও কোনো কথা বলতে চাইলো।

আবারও না দেখার ভান করলাম।

এবার সে তার বান্ধবীকে নিয়ে সরাসরি আমার মেসে এসে হাজির।

আমি গেট খুলতেই সে বললো, তোমার সমস্যাটা কি? আমার সঙ্গে কথা বলছো না কেন?

প্রথম তাকে সামনাসামনি দেখলাম। এতোটাই আশ্চর্য হয়েছিলাম এবং আমার গা হাত এতোটাই কাপছিল যে, কিছু না বুঝেই বললাম, কোনো সমস্যা নেই।

সে বলে গেল, এখন থেকে যেন প্রতিদিন আগের মতোই হাতের ইশারায় তার সঙ্গে কথা বলি।

তারপর থেকে সব ঠিকঠাক চলছিল। সম্পর্ক হওয়ার পর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, প্রথম চিঠি দেয়াতে তুমি কেন জুতা, ঝাড়ু দেখিয়েছিলে?

সে বলেছিল, তুমি একটা ছোট ছেলের হাতে চিঠি পাঠিয়েছ। চিঠিটি নিলে ও এলাকার সবাইকে বলে দিতো। তাই নেই নি।

কিন্তু সে আমাকে খুব মিথ্যা কথা বলতো।

তার সঙ্গে সামনাসামনি দেখা করার একটাই উপায় ছিল। তার স্কুল যাওয়ার পথে তার সঙ্গে কথা বলা। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করতাম, তোমার স্কুল কয়টায়?

সে হাতের ইশারায় দেখাতো সকাল সাড়ে পাচটায়।

ভাবতাম হয়তো কোথাও প্রাইভেট পড়ে স্কুলে যায়। তাই এতো সকালে যেতে হয়। শীতের সেই দিনগুলোতে সোয়েটার মাফলার পরে রাস্তায় দাড়াতাম ভোর পাচটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত। রাগে বাসায় ফিরে দেখতাম বারান্দায় বসে বসে সে পড়াশোনা করছে। তবুও তাকে খুব ভালো লাগতো।

সে যখন বারান্দায় আসতো তখন বারান্দায় কাপড় শুকানোর রশি নাড়তে নাড়তে আসতো। কাপড়গুলো দুলতে থাকলেই বুঝতাম সে আসছে।

হঠাৎ একদিন ফোন করলো সে।

খুব কষ্ট করে হাতের ইশারায় তাকে নাম্বারটা দিয়েছিলাম। ফোন করে দেখা করতে চাইলো।

প্রথম দিন তার সঙ্গে দেখা করার স্মৃতিটা আমার জন্য ছিল দুঃখের।

সে বললো, তারা বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে।

প্রথমে ভেবেছিলাম অন্য সব মিথ্যার মতো এটাও মিথ্যা। কিন্তু কিছু দিন পর যখন দেখলাম ঠেলাগাড়িতে করে তাদের আসবাবপত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন চোখের সামনে সব অন্ধকার দেখলাম।

বিকেলের মধ্যে তারা চলে গেল। সন্ধ্যায় তাদের বারান্দায় তাকালাম। সব ফাকা। কেউ সেখানে বসে আমাকে হাত নেড়ে কথা বলে না। কোনো রশি টাঙানো নেই, কোনো কাপড়ও দুলছে না। আমার খুব খারাপ লাগলো।

দুই চার দিনের জন্য চলে গেলাম আমার এক বোনের বাড়িতে। সেখান থেকে ফিরে এসে একদিন তার ফোন পেলাম।

সে আমাকে দেখা করতে বললো।

দেখা করলাম।

সে বললো, জানো, আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি এটা বুঝতাম না। যখন অন্য বাসায় চলে গেলাম তখন বুঝতে পারছি। আমার দিন কাটতেই চায় না। বাসায় ফিরে এসে মনে হয় আমি খুব একা। ভালো লাগতো না।

আস্তে আস্তে আমাদের দেখা করা বেড়ে গেল। এমন একটা সময় এলো যখন প্রতিদিন দেখা করতাম। তার বাসায় কোনো ভালো কিছু রান্না হলে সে আমার জন্য নিয়ে আসতো। আমাকে ছাড়া একা খেতে তার ভালো লাগে না।

আস্তে আস্তে আমার পরিবারের সকলকে জানালাম আমাদের ব্যাপারটা।

তার পরিবারও কিছু দিন আগে জেনেছে।

কেউ বাধা দেয়নি।

কিছু দিন পরই আমাদের সম্পর্কের তিন বছর পূর্তি।

আজও যখন সে আর আমি পুরনো কথা ভাবছিলাম তখন সে আমাকে বললো, সত্যি, তোমাকে অনেক অবহেলা করতে করতে অনেক ভালোবেসেছি। আমরা এখন অনেক সুখী।

আমাদের এই ভালোবাসার জন্য সেলিমভাই, শামীমভাই, নিপুণভাই, মেহেদিভাই, মৃদুল, বাবুভাই ও আমার বোনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ওনারা অনেক রিস্ক নিয়ে আমার চিঠিগুলো তার কাছে পৌছে না দিলে বা আমার বোনের কাছে ফোন করে আমাদের ভুল বোঝাবুঝির অবসান না করালে হয়তো এতো তাড়াতাড়ি আমরা এতো কাছে আসতে পারতাম না।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

ঐশী

– দিলরুবা সাঈদ সিক্তা

একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে চাকরি করি। বেশ ভালো লাগে ছোট ছোট বাচ্চাদের আধো বুলিতে ভুল ইংরেজি শুনতে। ভালোই কাটছিল দিনগুলো। হঠাৎ আমাদের কো–অর্ডিনেটর আমাকে একটা অফার দিলেন।

ফ্রান্সের একটি প্রতিষ্ঠানের আন্ডারে বেশ কিছু বাঙালি অনাথ শিশু রয়েছে। তাদের মধ্যে পাচজনের স্কুলে যাবার সময় হয়েছে। তাদেরকে আমাদের স্কুলে অর্থাৎ ইংলিশ মিডিয়ামে ওরা পড়াবে। তাই আমার কাজ হলো ওদেরকে স্কুলের জন্য তৈরি করা। প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ তিন মাস।

সবদিক ভেবে চিন্তে রাজি হয়ে গেলাম। যতোই দিন যেতে লাগলো, আমার বিস্ময় বাড়তে লাগলো। যদিও পড়াচ্ছি পাচজনকে তবুও সেখানে মোট আচল্লিশটি বাচ্চা এক বাড়িতে বসবাস করে। একই সঙ্গে ওদের পথ চলা ও বড় হওয়া। এদের কারো নাম রিতা দে, কারো নাম রোজ, মেরী আবার কারো বা নাম আল আমিন। কিন্তু এতে কারো কোনো অসুবিধা হয় না। ওরা এক সঙ্গে খেলাধুলা করে, মারামারি করে। আবার একে অন্যের দুঃখে কষ্টও পায়।

ওদের কারো সঙ্গে কারো চেহারা বা আচার–আচরণের কোনো মিল নেই, শুধু একটাই মিল তা হলো, সবার বাবা তো বটেই, মাও ছুড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। সেই ছুড়ে ফেলাটাও বিচিত্র। কাউকে ডাস্টবিনে, রেল স্টেশনে, আবার কাউকে ছুড়ে ফেলা হয়েছে তিন বা চার তলার বিল্ডিং থেকে ময়লার সঙ্গে মুড়িয়ে।

সেদিন থেকেই ভালোবাসার উত্থানপতনের সঙ্গে ওদের পরিচয়। যেখানে একটি শিশু মায়ের বুকের উষ্ণ ভালোবাসায় বেড়ে ওঠে সেখানে ওরা বেড়ে উঠছে মাইনে করা মায়েদের যত্নে। সকালে এক মা, দুপুরে একজন আবার রাতে অন্য আরেকজন। এই পরিবর্তনের খেলায় ওদের কারো ভালোবাসাই জমাট বাধে না। ছড়িয়ে পড়ে আটচল্লিশ জন ভাইবোন এবং গোটা বিশেক মায়েদের মধ্যে। তাও ভালোবাসতে হয় রুটিন মাফিক নিয়ম মেনে।

এই নিয়ম মাফিক পথ চলাতে ওদের সুবিধা হয় কি না বুঝতে পারি না। কিন্তু যখন ভাবি, ওরা বড় হয়ে যখন নিজের সম্পর্কে বুঝতে পারবে, অনুভব করবে ওদের একাকীত্ব তখন শিউরে উঠি। তাহলে কি জন্মই ওদের আজন্ম পাপ! হতাশ হই। প্রচণ্ড রাগ হয় সেই সব মায়েদের ওপর যারা তাদের সন্তানকে পর্যন্ত কাছে রাখার সাহস পায়নি।

একদিন আমারই মতো এক টিচারের কাছে রাগটা প্রকাশ করে ফেললাম।

তিনি আমাকে জানালের সেই সব অসহায় মায়েদের কথা যারা প্রেমিকের মিষ্টি কথায় ভুলে ভালোবাসার মাশুল দিচ্ছে সন্তান ধারণ করে। কিন্তু পরে না পাচ্ছে প্রেমিকের ভালোবাসা, সমাজের সুদৃষ্টি কিংবা অতি আদরের সন্তানকে কাছে রাখতে। কারণ তারা কুমারী মাতা।

সবদিক হারিয়ে এক বুক চাপা কষ্ট নিয়ে তারা হয়তো বেচে আছে। কারো কাছে প্রকাশ করে কষ্ট হালকা করার সুযোগটুকুও তাদের নেই।

আর রাগ করতে পারি না তাদের ওপরও। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে সৃষ্টিকর্তার ওপর। ভালোবাসার পরিণতি এতো ভয়ঙ্কর!

এরই মধ্যে আমার কাজ প্রায় শেষ। বাচ্চাদের অ্যাডমিশন টেস্ট হয়ে গিয়েছে। ভর্তির সব কাজ প্রায় শেষ ২৩ তারিখের মধ্যে। আমার চাকরি যেহেতু ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত, তাই যেতে হচ্ছে প্রতিদিনই।

২৭ তারিখে গিয়ে একটু গুমোট আবহাওয়া টের পেলাম। অফিসে কেউ নেই।

বাচ্চাদের মন খারাপ।

মায়েদের মুখ করুণ।

একজন মাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি জানালেন, ঐশী খুব অসুস্থ। ওকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বাচ্চাটার নাম ঐশী শুনে একটু অবাক হলাম। কারণ ঐশীকে আমি চিনি। ও জন্ম থেকেই পরিপূর্ণ ছিল না। প্লাস্টিক সার্জারি ও কৃত্রিম অঙ্গপ্রতঙ্গের মাধ্যমে বাচিয়ে রাখা হয়েছিল বাচ্চাটিকে। ওকে পাওয়া গিয়েছিল ঢাকা মেডিকাল কলেজের করিডোরে। জন্মের পর পরই জন্মদাত্রী ফেলে চলে গিয়েছিল। এরা পরম মমতায় আগলে রেখেছে সাড়ে তিনটি বছর।

যে মেয়ে কখনোই পনেরো বিশ দিনের বেশি দিন সুস্থ থাকে না তার হাসপাতালে যাওয়ায় সবার কষ্ট দেখে আবারও অবাক হই। চুপচাপ কাজ শেষ করলাম। ফেরার পথে দেখলাম একজন মা কাদছেন। খবর এসেছে ঐশীর অবস্থা আরো খারাপ। এবার বোধহয় আর বাচবে না।

সন্তান অসুস্থ হলে মায়েরা তো কাদবেনই। সেই স্বাভাবিক কান্না এতো অস্বাভাবিক সুন্দর হতে পারে আমার জানা ছিল না।

ঐশীর চেহারা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। নিশ্চয় মেয়েটি মৃত্যু ভয়ে কাতর। আচ্ছা, ঐশী কি জানে মায়ের চেয়েও অনেক অনেক বেশি ভালোবাসা নিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছে বসে কিছু মানুষ? জানে বোধহয়। শিশুরা অনেক কিছুই আগেই বুঝতে পারে। সৃষ্টিকর্তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে এলো এতো অসাধারণ গুণ মানুষকে দেয়ার জন্য।

শুধু বাবা বা মায়ের ভালোবাসা নয়, এইসব শিশু বড় হয়ে উপলব্ধি করুক, পৃথিবীময় মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা যা তাদেরকে কখনোই যেন বুঝতে না দেয় একাকীত্ব।

মনে মনে ঐশীর জন্য এবং ঐশীর মতো সব শিশুদের জন্য প্রার্থনা করে ত্রস্ত পায়ে বের হয়ে এলাম সেখান থেকে।

গাজীপুর থেকে

শূন্যতা

– আমান উল্লাহ

বিয়ের অনুষ্ঠানে মেয়েটিকে দেখেই মনে হলো, তাকে কোথায় যেন দেখেছিলাম। তবে ঠিক মনে করতে পারছি না। আগে যদিও দেখেছি তবুও এবারে খুব ভালো লেগে গেল। তাই একজনকে দিয়ে তার নামটা যখন জেনে নিয়েছি তখন সব ছায়াছবির মতো মনে পড়ে গেল।

মেয়েটি স্কুল জীবনে আমার ক্লাসমেট ছিল। আমাদের স্কুলে ছেলেদের এবং মেয়েদের আলাদা রুমে ক্লাস চলতো বলে পরিচয় ছিল না।

নাম জেনেই আস্তে আস্তে কথা বলার সুযোগ খুজতে লাগলাম। অজান্তেই হয়তো ভালোবেসে ফেলেছি। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, বিয়ের অনুষ্ঠানে এতো ঝামেলার পরও আমার চোখ দুটো যেন ওকেই খুজছে। সমবয়সীরা সবাই গল্প করছি। কিন্তু আমার মন গল্পে নেই। রেখাকে দেখার জন্য মন ব্যকুল হয়ে আছে। যদিও দুই মিনিট আগেই তাকে দেখেছি।

বুকের কোথায় যেন এক ধরনের ব্যথা লাগছে যা ঠিক সুখের, নাকি দুঃখের বুঝতে পারছি না।

বেলাল নামের একটি ছেলে যেন হঠাৎ করেই বললো, এই চায়ের কাপটা শক্ত করে ধর না, পড়ে যাবে তো!

লক্ষ্য করলাম হাত, পা কাপছে তাকে না দেখার বিরহে।

বিয়ের অনুষ্ঠানে ছবি তোলার দায়িত্ব পড়লো আমার ওপর। ঘুরে–ফিরে সেই মেয়েটিরও অনেক ছবি তুলেছি। অবশ্য তা দেখার সৌভাগ্যও আমার হয়নি। এক সময় তারা চলে গেল।

খোজ নিয়ে জানতে পারলাম কনেপক্ষ আগামীকাল বরের বাড়িতে আসবে তাদের মেয়েকে দেখতে, সঙ্গে রেখাও আসবে। তাই বরের বাড়িতে থেকে গেলাম।

আমাদের এখানে কনেপক্ষ বিয়ের পরদিন মেয়েকে দেখতে এলে তাদের ফুল এবং চকলেট, আচার এসব দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। এ কাজটা করে পনেরো ষোল বছর বয়সী মেয়েরা।

যেহেতু রেখাও আসছে, তাই তাকে ফুল এবং চকলেট দেয়ার সুযোগ হাতছাড়া না করে আমিও লাইনে দাড়ালাম। অতিথিরা যখন এসে পৌছালো তখন আশা ভঙ্গ হলো। রেখা এলো না, এলো তার মা। অনেকটা রাগ করেই একটা ফুল ও দুটো চকলেট–এর পরিবর্তে তাকে দুটো ফুল এবং বেশ কয়েকটা চকলেট দিলাম।

তিনি জানতে চাইলেন গতকাল তার মেয়ের ছবি কে তুলেছে।

হঠাৎ একি সমস্যা! বললাম, আমি তো অনেকের ছবি তুলেছি। আপনার মেয়ে কোনটা তা তো জানি না।

কোনো মতে বাচলাম এবং বাড়ি চলে এলাম।

ফার্স্ট ইয়ারে ক্লাস করতে এসেই আবার তার সঙ্গে দেখা।

তাকে দেখতে মন চাইতো খুব প্রতি ক্ষণে ক্ষণে। তাই প্রতিদিন তার আসা যাওয়ার পথে দাড়িয়ে থাকতাম।

খুব গুছিয়ে তাকে একটা চিঠি লিখলাম।

হ্যা বা না কোনো উত্তর পেলাম না।

সে আমাকে ভালোবাসে কি না জানি না।

আশা–নিরাশায় দিন কাটতে লাগালো।

কিভাবে যেন তার মা এসব জেনে গেলেন।

একদিন তাদের পাশের বাড়ির একটি ছেলে জানালো, তার মা তাকে খুব বকেছেন এবং মেরেছেন। বলে দিয়েছেন, রেখাকে আর পড়াবেন না, বিয়ে দিয়ে দেবেন।

বললাম, কলেজে সে একটিবারও আমার সঙ্গে কথা বলেনি। যদি কোনো দোষ হয়ে থাকে সেসব আমার। তাকে শাস্তি দেবেন কেন?

ছেলেটি বললো, এক হাতে তালি বাজে না।

মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল। বললাম, এই দেখো, বাজে কিনা বলে নিজের পাছায় দুটো বড় চাটি মারি এবং চলে আসি।

সে দুদিন কলেজে আসেনি।

রাগে, দুঃখে কিছু খেতে পারছি না। রাতে খুব জ্বর হলো। তাই পরদিন ক্লাসে যেতে পারিনি।

এর পরদিন সেই ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, পরিস্থিতি কেমন?

আগের মতোই। তার মা সিদ্ধান্তে অটল। তবে তোমাকে যেতে বলেছে।

ধড়াস করে বুক কেপে উঠলো। বয়স ছিল কম। তার মায়ের সামনে কিভাবে দাড়াবো! অপরদিকে শুধু আমারই কারণে একটি মেয়ের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে, স্বপ্ন ভেঙে যাবে এই ভাবনাও আমাকে কাবু করে ফেলেছে।

ছেলেটিকে বললাম, আমি যাবো না। তবে রেখার মাকে তুমি বলবে যে, তার মেয়ের পথ থেকে আমি একেবারেই সরে দাড়াবো। কখনো বিরক্ত করবো না বা তার আসা–যাওয়ার পথে দাড়িয়েও থাকবো না। তিনি যেন রেখার লেখাপড়া বন্ধ না করেন। না হলে ভয়ংকর পরিণাম হবে, যদিও ভয়ংকর পরিণামটা যে কি সেটা আমিও জানি না।

যাহোক, তার লেখাপড়া বন্ধ হয়নি।

আমিও আমার কথা রেখেছি। বহু কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছি। সকাল হলেই পা দুটো আপনাআপনি হেটে পুরনো সে পথে চলে যেতে চাইতো।

কিছু দিন পর পারিবারিক কারণে আমার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। কলেজে যেতে হয় না। মোটামুটি রেখাকে ভুলে থাকার পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি।

অনেক দিন পর এসএসসি মার্কশিটটা ছাড়িয়ে নিতে কলেজে গেলাম। চলে আসছি। এমন সময় সিড়িতে রেখার সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দেখা। মনে হলো তার চোখে প্রশ্নের ঢেউ, এতোদিন কোথায় ছিলেন? বা কতোদিন দেখিনি তোমায়। অবশ্য এটা আমার ভুল ধারণাও হতে পারে।

কিন্তু আমার যে বড় ক্ষতি হয়ে গেল! তার চোখে চোখ পড়তেই সমস্ত শরীর কেপে উঠলো, হৃদপিণ্ডটা বেসুরে লাফাচ্ছে। পুরনো অসুখ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। অদ্ভুত শূন্যতায় ভরে গেল মন।

এই যে অজানা হাজারো অনুভূতি, এর উৎপত্তি কোথায়? এটাই কি ভালোবাসা? তাই যদি হয় তবে এসব অনুভূতি কি একাই আমার? রেখা কি আমাকে কখনো ভালোবেসেছিল বা আদৌ ভালোবাসতো?

সুয়াবিল, ফকিছড়ি, চট্টগ্রাম থেকে

বড় আপু

– এমএসকে মাসুদ

একজনকে ভালোবাসি নিজের জীবনের চেয়েও বেশি। তিনি আর কেউ নন, তিনি আমার বড় আপু। আমার এ পথ চলার পেছনে তার অবদান ধ্রুব সত্য। সে ছোটবেলা থেকেই আমাকে মানুষ করার জন্য সর্বদা ব্যকুল থাকতেন। তার কাছ থেকে পেয়েছি আদর, ভালোবাসা সব। কারণ তিনিই আমার অ, আ, ই, ঈ শিখিয়েছেন। যখন একটু একটু পড়া শুরু করছি তখন থেকেই তিনি আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন।

গ্রামের ছেলেরা পড়তে আসতো আপুর কাছে। সেখানে নির্দ্বিধায় আমাকে পড়তে বসাতেন। আমার মনে পড়ে, ভাত সামনে করে বই নিয়ে বসাতেন। যদি পড়া ঠিকমতো না হতো তাহলে খেতে দিতেন না।

প্রচণ্ড রাগ হতো তখন। কিন্তু যখন সব বুঝতে পারলাম তখন তার প্রতি শ্রদ্ধা দ্বিগুণ হয়ে যায়।

এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা বেড়াতে আসি। পরীক্ষা খারাপ হবার জন্য বাড়িতে যাওয়ার সাহস পাইনি রেজাল্টের দিন। রেজাল্ট হলো। বার বার জানতে চেষ্টা করেও জানতে পারিনি। হতাশা, রাগে, অভিমানে বাড়ি যাওয়ার চিন্তা একদম বাদ দিলাম।

হঠাৎ চিঠির মাধ্যমে জানতে পারলাম পাস করেছি। খুশি যেন আর ধরে না। পরের দিন বাড়িতে গেলাম।

আপু আমাকে দেখে কেদে ফেললেন।

সাভার ইউনিভার্সিটি কলেজে এইচএসসি–তে ভর্তি হলাম। গ্রামের ছেলে, স্বভাবতই শহরকে মানিয়ে নিতে হিমশিম খেতে হচ্ছিল যার প্রভাব (ফার্স্ট সেমিস্টার) রেজাল্টে পড়লো।

এভাবেই দিন চলে যেতে থাকে।

বন্ধুরা অনেকেই নেশা করে, আমাকে মাঝে মধ্যে অফার করে। কিন্তু বড় আপুর কথা চিন্তা করে তার আদর্শে বড় হতে থাকি।

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সময় টেস্ট পরীক্ষা সামনে, কলেজে বেতন, সেশন ফি সব মিলে পাচ হাজার বাকি।

অধ্যক্ষ মহোদয়ের দয়াতে টেস্ট পরীক্ষা শেষ হলো।

রেজাল্ট একটু খারাপ হয়েছিল।

এবার ফরম ফিল আপ করতে টাকা বাকি ছয় হাজার পাচশ টাকা।

আপুকে জানালাম।

অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে আবেদন পেশ করলাম।

তিনি সরাসরি বললেন, টাকা নেই তো পড়তে এসেছো কেন?

নিজেকে তখন কীটপতঙ্গ ভাবতে শুরু করেছি।

অধ্যক্ষ মহোদয় একটু সদয় হলেন। বললেন, চার হাজার পাচশ টাকা হলে ফরম ফিল আপ করো। না হলে সামনের বার পরীক্ষা দিও।

আপুকে ইতিমধ্যে জানিয়েছি।

দুই দিন পর আমার বন্ধু হেলালকে দিয়ে তিন হাজার টাকা পাঠিয়েছেন। সঙ্গে একটা চিরকুট। তার ভাষা ছিল এ রকম :

মাসুম,

শুভেচ্ছা নিও। সুদ করে তিন হাজার টাকা পাঠালাম। তুমি যেভাবেই পারো ম্যানেজ করো। বুঝতেই পারছো, আমি কেমন আছি তোমার চিন্তায়, সময় পেলে বাড়িতে এসো।

ইতি

আপু

চিঠি পড়ে আপুর কথা চিন্তা করছি। আমি হলে কি আপুর জন্য এতো কিছু করতাম! ফরম ফিল আপ হলো। পরীক্ষা শেষ হলো। দেখতে দেখতে রেজাল্ট হলো। আমি পাস করলাম। কিন্তু বাড়িতে সংবাদ দিইনি।

আপু অনেক রাতে আমার বড় ভাইয়ার কাছ থেকে জেনেছেন রেজাল্ট।

এখানে বলে রাখি, ভাইয়া রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করেন। তাকে ফোন করেছিলাম।

সেই রাতেই আপু আমার প্রিয় শিল্পী জেমস-এর গান বাজিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন।

বাড়ি যাই বেশ কয়েকদিন পর। তিনি আমাকে স্বর্ণের আংটি বানিয়ে দেন।

আজ আমি অনার্সে পড়ি। তার দাবিদার বড় আপু। সেদিনের তিন হাজার টাকা না হলে আজ এতোদূর আসা সম্ভব হতো না।

সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই যে, এ রকম একটা বড় আপু দেয়ার জন্য। তার কাছে তো কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই। বড় আপুকে জানাই অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।

বগুড়া থেকে

তোমার প্রতি

প্রিয়, কেমন আছো তুমি? খুব জানতে ইচ্ছে করে। তুমি বিনা আমি ভালো নেই। তুমি আমায় ভালো থাকতে দিলে না। বেশ তো ছিলাম একা। কারো জন্য পিছু টান ছিল না। কারো কথা ভেবে বিনিদ্র রাত কাটাতে হতো না। কিংবা কারো স্মৃতি রোমন্থন করে কষ্ট পেতে হতো না। কেন এলে তুমি আমার জীবনে! যদি এলেই তাহলে আমাকে এতো কষ্ট দাও কেন? তুমি কি বোঝো না, তোমাকে ছাড়া এক মুহূর্ত চলতে পারি না। প্রতিক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত শুধু তুমিই বিচরণ করো আমার ভাবনার জগতে, আমার কল্পনার রাজ্যে। নিদ্রায়-নির্জনে, আত্মহননে কেবল তুমিই আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী।

ভালোবাসা কি আমি জানতাম না। প্রেম শব্দটি সম্পর্কে সেদিনও ছিলাম সম্পূর্ণই অজ্ঞ। সারা জীবন কেবল পড়াশোনাকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছি। এর বাইরের জগতের সঙ্গে কোনো পরিচয় ছিল না আমার। কি বোকা ছিলাম আমি!

তোমাকে পাবার আগ মুহূর্তেও প্রেম সম্পর্কে এক প্রকার নেতিবাচক ধারণা ছিল আমার। ভাবতাম ওটা বোধহয় অবাঞ্ছিত কিছু। বিশেষ করে আমার সিনিয়র আপু কিংবা ভাইয়াদের যখন দেখতাম এ বিষয়টি সবার অগোচরে রাখতে সার্বক্ষণিকভাবে সচেতন তখন আমার মধ্যে এ ধারণা আরো দৃঢ় এবং বদ্ধমূল হতে থাকে। তাই এক রকম প্রতিজ্ঞাই করেছিলাম, ভুলেও এ পথে পা বাড়াবো না। এ জন্যই তো যতো প্রেমের অফার পেয়েছি, সবই এক বাক্যে *না* করে দিয়েছি।

হাসির কথা কি জানো? ক্লাস সিক্সে যখন পড়ি তখনই জীবনের প্রথম প্রেমের অফার পাই। আর এ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই। সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পাওয়া প্রথম প্রেমপত্রটি মেজআপুর কাছে হস্তান্তর করি নিজে একটু খুলে না পড়েই।

মেজআপু সব দেখে বলল, খবরদার, ওসব যেন আর না শুনি, তুমি ভালো স্টুডেন্ট, তোমাকে নিয়ে আমাদের অনেক স্বপ্ন। তোমাকে অনেক দূর যেতে হবে।

সুতরাং কি আর করা!

অথচ তুমি আমার জীবনের অফুটন্ত কলিটির এক এক করে পাপড়িগুলো খুলে দিয়ে কখন যে একটি পরিপূর্ণ ফুলে পরিণত করে দিলে বুঝতেই পারিনি। তোমার কাছ থেকেই জেনেছি প্রেমের অর্থ, ভালোবাসার সংজ্ঞা। তুমি আমাকে পরিপূর্ণ জীবন দান করেছো, জীবনের মানে বুঝতে শিখিয়েছো। এখন বুঝতে পারছি, বিপরীত লিঙ্গের কোনো সঙ্গীর অকৃত্রিম ভালোবাসা ছাড়া জীবন কখনোই পরিপূর্ণ হতে পারে না।

কিন্তু কেমন মানুষ তুমি! প্রেমের তরী ভাসিয়ে দিয়ে মাঝ নদীতে আমাকে একা ফেলে চলে গেলে অনেক দূরে। আমি সেই ভরা নদীর অথৈ জলের ঢেউ-এ কেবল ভাসছি, কোনো তীর খুজে পাচ্ছি না। তোমার স্মৃতিগুলো বুকে লালন করে বেচে আছি। আর প্রহর গুণছি কবে তোমার দেখা পাবো। জানি না সেই কাঙ্ক্ষিত ক্ষণটি আমার জীবনে কবে আসবে! আদৌ আসবে কি না সে ব্যাপারেও অনিশ্চিত। তারপরও আশায় বুক বেধে আছি।

কতোটা অসহায় আর ভাগ্যহীন আমি। তোমাকে শেষ দেখেছি গত বছর ১৮ সেপ্টেম্বর। তারপর এতোগুলো ক্ষণ, দিন, মাস কিভাবে থেকেছি, কিভাবে কেটেছে আমার একান্ত সময়গুলো, বিরহী ক্ষণগুলো বুঝতে চেষ্টা করেছো কখনো? প্রতিটি মুহূর্ত তোমার অভাব, তোমার শূন্যতা আমায় যন্ত্রণা দেয়, তুমি কি বোঝো সে কথা?

বিশেষ দিনগুলোতেও তোমায় কাছে পাই না। তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর কেটে গেল আমার জন্মদিন, ৫ অক্টোবর তোমার জন্মদিন, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস। এ দিনগুলো কাটিয়েছি নিরানন্দে, নিরুৎসাহে। শুধু তুমি নেই বলে সব কিছুই আমার কাছে অর্থহীন, বিবর্ণ, মলিন মনে হয়। আনন্দের এই দিনগুলোতে তোমাকে একটু শুভেচ্ছাও জানাতে পারিনি। তোমার হাতে একগুচ্ছ বেলি ফুল তুলে দিয়ে বলতে পারিনি *ভালোবাসি তোমায়*।

২৩ মার্চ তোমার–আমার ভালোবাসার এক বছর পূর্ণ হবে। কিন্তু এ দিনটিতেও তোমাকে কাছে পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এদিনও আমাকে কাটাতে হবে নির্জনে চোখের পানিতে ভেসে।

এই এক বছরে তোমাকে কাছে পেয়েছি মাত্র তেইশটি দিন (দুই+এক+বিশ দিন)। বাকি দিনগুলো কাটিয়েছি তোমার ছবি দেখে, ছবির সঙ্গে কথা বলে। প্রতি রাতে ঘুমাতে যাবার আগে তোমাকে দেখে এবং তোমাকে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম থেকে জেগে তোমার ছবি সামনে নিয়ে চোখ খুলেছি।

আমি জানি, তোমাকে যতোটা না ভালোবাসতে পেরেছি, তারচেয়ে তুমি আমাকে বেশি ভালোবাসো। তোমার কষ্টটা আমার চেয়ে অনেকগুণ বেশি। তুমি ভাগ্যের হাতে বন্দী। আমাকে সময় দেয়ার মতো অফুরন্ত সময় তোমার নেই, সেও বুঝি। কিন্তু মনকে যে কিছুতেই বোঝাতে পারি না। কিছুতেই যে মানতে পারি না, তুমি কাছে নেই। তোমাকে একটু দেখতে পাবো না।

তোমাকে কাছে পাবার যে আকুলতা, এক পলক দেখার যে হাহাকার, তৃষ্ণা তা বুঝি জনম জনম দেখেও মিটবে না।

প্রিয় যদি দূরে সরে যায়, সে যে আরও প্রিয় হয় জানি গানের এ কলিটি বহুবার শুনেছি। গুন গুন করে গেয়েছিও অনেকবার। কিন্তু এর ভাবার্থ বোঝার চেষ্টা করিনি কখনো। এখন বুঝতে পারছি কথাটি আমার বেলায় কতোটা প্রযোজ্য।

এ লেখাটি আমার পরীক্ষা চলার সময়ে লিখছি। তাই বেশি দূর এগোবো না। তুমি ভালো থেকো প্রিয়, খুব ভালো। জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতায় দাড়িয়েও আমাকে মনে রেখো। কখনো ভুলো না আমায়। আর জেনে রেখো, তুমি আছো আমার অন্তরের অন্তঃস্থলের গোপন ঘরে যেখানে থেকে তোমাকে কেউ সরাতে পারবে না কখনোই।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

দাম্পত্য

– এ এফ কাঞ্চন বাহাদুর

জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির সরকার ও রাজনীতি বিভাগে পড়ছে বনি ও ইফতি। তাদের মাঝে জানাশোনা অনেক দিন থেকে। তাদের একজনের প্রতি আরেকজনের আগ্রহটা প্রবল। তাই মাস্টার্স পরীক্ষার পর বনি–ইফতি তাদের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুকে ডেকে বিয়ের কাজটা সেরে ফেলে।

বন্ধুদের দাবি ছিল, বাসর যেন *হোটেল সোনারগাও*–এ হয়।

এক্ষেত্রে ইফতির আপত্তি। তার কথা হচ্ছে, বাসরটা সাভার *পর্যটন মোটেল*–এ করে সোনারগাও–এর খরচটা বাচিয়ে কক্সবাজার থেকে হানিমুন সিজনটা কাটিয়ে আশা যাবে।

এতে বনিও সায় দেয়।

ইফতির সঙ্গে বনির সায় থাকায় বন্ধুরাও সাভারকে তাদের বাসরের জন্য মেনে নেয়।

বন্ধুরা হলুদ গাদা দিয়ে চমৎকার করে সাভার পর্যটন মোটেলের দুইশ তিন নাম্বার রুমটি সাজিয়ে দেয়। বন্ধু–বান্ধবদের উৎসব দেখে মনে হচ্ছে, বনিদের আনুষ্ঠানিক বিয়ে।

বনিকে বিয়ে করে ইফতি তার পরিবার নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয়। কারণ একমাত্র সন্তান হওয়ায় ইফতির সব আবদার এবং কর্মকাণ্ড তার বাবা-মা মেনে নেন। কিন্তু বনি তার বাবা এবং বড় দুই বোনকে নিয়ে চিন্তিত। সুযোগ পেলেই বড় বোনরা তার ওপর ছড়ি ঘোরায়। বাবার খবরদারিতো আছেই। তাছাড়া বাবা প্রেশারের রোগী।

এদের বিয়ের সংবাদ বাবা কিভাবে গ্রহণ করবেন তা বনিকে ভাবিয়ে তুলছে। তার ওপর ইফতিকে চেংড়া চেংড়া লাগে এবং এখনো বাবার খরচে চলে। তাকে কিভাবে বনি তার বাবার সামনে নিয়ে যাবে। এসব নিয়ে বনি বিয়ের পরের সপ্তাহে ইফতির কোলে মাথা রেখে ভাবছিল। ওই সময় ইফতি তাকে শোনায়, আগামীকাল সকাল দশটায় বেসরকারি একটা এয়ারলাইন্সে তারা কক্সবাজার যাচ্ছে।

কক্সবাজার বিচ, বার্মিজ মার্কেট এবং হিমছড়িতে ঘুরে দুই দিন পর তারা ঢাকায় ফিরে যে যার গন্তব্যে চলে যায়। ইতিমধ্যে সি-বিচে এবং বাসরে তোলা ছবিগুলো বনির মা দেখে ফেললে সে সমস্যায় পড়ে যায়।

ওই দিকে ইফতি ছবিগুলো তার মাকে স্বেচ্ছায় দেখায়।

ছবি দেখে পুত্রবধূকে পছন্দ হয়ে যায়। তাই দুই দিন পরই বৌকে বরণ ইফতির বাবা-মা করতে চলে যান নোয়াখালীর রায়পুর থানায়।

বনির বাসায় তার শ্বশুর-শাশুড়ি এলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়।

এখন দুজন একই ছাদের নিচে থাকছে। বনি-ইফতি অস্থির সঙ্গে অস্থি, মজ্জার সঙ্গে মজ্জা মিলিত হয়ে এক আত্মায় পরিণত হয়েছে। তাদের এ বোঝাপড়া দেখে দুই পরিবারের মন্তব্য, ইফতি-বনি একে অপরকে তাবিজ করেছে। এরা একজন বাইরে থেকে এলে একজন অপরজনকে বা বাইরে যেতে কিস করবে। দুজন একত্রে খাবে এক প্লেটে। বাসায় কে আছে, না আছে সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সারা দিন কিভাবে যে এরা এতো কথা বলে!

এসব দেখে ইফতির মা (লজ্জা পেয়ে হয়তো) আলাদা বাসায় উঠেছেন।

বিয়ের পর ইফতি কাজে হাত দিয়েছে। বনিও একটা ফার্মে কাজ করছে। দুজন অবসর বা ছুটি পেলেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল চষে বেড়াবে, না হয় পাশের কোনো দেশ বেছে নেবে।

এদিকে দাম্পত্য জীবন তিন বছর পার। তাই উভয়ের বাবা-মায়ের চাহিদা নতুন অতিথি। তাদের কথা হচ্ছে, তারা তাদের ভালোবাসায় আপাতত কাউকে ভাগ দিতে রাজি নয়। অবশ্য বনির মাঝে মধ্যে মা হতে ইচ্ছে জাগে। পারে না শুধু ইফতির জন্য।

অবশেষে পাচ বছর যাওয়ার পর *ছেলে হোক মেয়ে হোক একটাতে যথেষ্ট,* এ শর্তে ইফতি সায় দেয়।

যতোই ডেলিভারির দিন ঘনিয়ে আসছে, বনির প্রতি ইফতির সেবা, শুশ্রূষা, আদর-যত্ন আরো বেড়ে যেতে থাকে।

এখন ইফতি চিন্তিত, নরমার না সিজার করবে। নরমাল ডেলিভারি হলে বনি বেশি কষ্ট পাবে। আর পেট কেটে সিজার করলে *দাগ* থাকবে কি না এসব নিয়ে সে চিন্তিত।

অবশেষে বনির কষ্টের কথা চিন্তা করে ইফতি সিজার করতে সম্মত হয়। তবে ইফতি তার ডা. রুবীভাবীকে জানায়, অপারেশন থিয়েটারে সেও থাকবে।

ডাক্তার ভাবী সম্মতি দেন।

বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হলে সেদিকে ইফতির আগ্রহ নেই। তার আগ্রহ বৌটা কখন জ্ঞান ফিরে পাবে।
এদিকে তাকে ডাক্তার, ফার্মাসি এসব নিয়ে দৌড়াতে হচ্ছে।
এমন সময় বনির জ্ঞান ফিরে এলে তার মা বলেন, বনি দেখ, দেখ, তুই চমৎকার একটা বাচ্চা জন্ম দিয়েছিস।
সেদিকে বনির কোনো আগ্রহ নেই। তার প্রশ্ন, মা, ইফতি কোথায়?
মা জানান, ডাক্তারের কাছে।
তখন সে তার পাশে বসা যুবক ভাইটিকে বলে, তুই একটু এদিক-সেদিন যেতে পারিস না, ইফতিটা আজ দুই দিন শুধু দৌড়াচ্ছে।
ইফতি এলে বনি চমৎকার একটা হাসি দেয়।
অনেক আত্মীয়-স্বজনের সামনে বনির কপালে ইফতি একটা কিস বসিয়ে দেয়।
বনিও সেভাবে উত্তর দেয়।
কেউ প্রকাশ্যে কিছু না বললেও বনির বৃদ্ধ নানি বলে ওঠেন, *অস্তাগফেরুল্লা, কোন দুনিয়ায় আইলাম*।

রায়পুর, লক্ষ্মীপুর থেকে

আমার পাওয়া না পাওয়া

অনার্স ফাস্ট ইয়ারে থাকতে আমার বন্ধুদের ভেতর উজ্জ্বলকে আমার আস্তে আস্তে ভালো লাগতে শুরু করে এবং ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষার কয়েকদিন আগে তার এক বন্ধুর মাধ্যমে আমাদের দুজনের সম্পর্ক শুরু হয়।
এরপর দুই বছর কেটে গেল। কিন্তু প্রায়ই আমাদের মাঝে ঝগড়া হতো ওকে ঠিক মতো সময় দিতে না পারার জন্য। এভাবেই পাওয়া না পাওয়ার মাঝে আমাদের দিন কেটে যাচ্ছিল।
অনার্স থার্ড ইয়ারে ওঠার পর ইন্টারমিডিয়েট পড়ুয়া কাজিন আমাদের বাড়িতে আসে পড়ালেখার হাত ধরে। যেহেতু ও আমার থেকে ছয় বছরের ছোট, তাই ওর সঙ্গে প্রয়োজনে বাইরে যেতে, গল্প করতে কোনো কিছুতেই কোনো বাধা ছিল না। অল্প কিছুদিন পর ওর জন্ডিস হয়। ফলে ওকে একটু সেবা করতাম।
ওর সুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটাও আরো ভালো হলো। মাঝে মধ্যেই ইয়ার্কির ছলে ও আমাকে ওর বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরতো। ও আমার সঙ্গে এ ধরনের আচরণ করলেও ওকে লজ্জায় কিছুই বলতে পারতাম না।
খুব মানসিক যন্ত্রণা পেতে শুরু করি এবং উজ্জ্বলকে আমাদের বিয়ের জন্য চাপ দিতে থাকি যাতে আমি ওর কাছ থেকে হারিয়ে না যাই। কিন্তু ও আমাকে এখনো বিয়ের সময় হয়নি বলে অনেক বোঝাতে থাকে। এরপর বাড়ি থেকে সহজে বের হতে পারিনি। তাই ওর সঙ্গে আস্তে আস্তে দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে।

খুব পাপ বোধ করতে থাকি যখন আমার কাজিন শেভ করতে গিয়ে শেভিং কৃম মাখা অবস্থায় আমাকে প্রথম কিস দেয় এবং আমার সারা মুখে কৃম মাখিয়ে দেয়। এরপর কি হতে কি হলো? কিছুদিন পরই কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে ও আমার সতীচ্ছদ ভাংলো।

আমরা দুজন দুজনের মাঝে হারিয়ে গেলাম। অথচ তারপরও উজ্জ্বলের জন্যই আমার ভালোবাসা অনুভব করেছি।

আশ্চর্য ব্যাপার হলো, আমার কাজিনের জন্য কোনো ভালোবাসা ছিল না। কাজিনের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কের কারণে উজ্জ্বলকে অনেক কষ্ট সত্ত্বেও এড়িয়ে চলতে শুরু করি। কারণ ওকে ঠকাতে পারবো না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, আমার ভুলের কারণে দেহটা যাকে দিয়েছি তাকেই বিয়ে করবো। এরপর আমার কাজিনের প্রতি আস্তে আস্তে আমার সব ভালোবাসা জন্ম হতে লাগলো এবং এক সময় ওকে আমার সমস্ত সত্তা উজাড় করে পাগলের মতো ভালোবাসতে থাকলাম।

বহুবার আমরা আমাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়েছি। কিন্তু বিয়ের কথা বললেই ও সব সময় এড়িয়ে চলতো। তখন খুব কান্নাকাটি করতাম।

ও আমার কান্না দেখে প্রায়ই আমাকে বোঝাতো, আমাদের দুই পরিবারের কেউ কখনো আমাদের বিয়ে মেনে নেবে না। তারপর বহুবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর কোনো সম্পর্ক রাখবো না। কিন্তু এক দুর্নিবার আকর্ষণে লজ্জার মাথা খেয়ে আমরা আলাদা হতে পারিনি। ফলে আমাদের মেলামেশা নিয়মিত হতে লাগলো।

সুযোগ পেলেই ও আমাকে ওর বুকের মাঝে জড়িয়ে নিতো এবং আমাদের দুজনের ঠোঁট এক হতো। তারপর ওর মুখ আমার বুকে চলে আসতো। কিছুদিন পরই বাড়ির লোকজন হালকা আভাস পেলো। এর ফলে আমার বিয়ের জন্য সবাই উঠেপড়ে লাগলো ও ততোদিনে এইচএসসি পাস করেছে। ফলে পড়ার জন্য যশোর পাঠানো হলো।

ও যশোর যাবার দশ পনেরো দিনের মাথায় আমার মাঝে অন্য কিছু অনুভব করলাম। ওকে খবর দিলে আমাকে অনেক বুঝিয়ে আমার অ্যাবর্শনের ব্যবস্থা করে দিয়ে যায় এবং এরপর আমার অসুস্থতার কারণে ও আমাকে যে আদর দিয়েছিল তা কখনো ভোলার নয়।

তার মাস তিনেক পরই আবারও গর্ভধারণ করি। এবং ওকে অনেক বোঝাতে থাকি অ্যাবর্শন না করার জন্য। কিন্তু আমাদের আর কোনো উপায় না থাকার কারণে আমার মাতৃত্বকে বিসর্জন দিয়ে আবারও আমাদের ভালোবাসার ফসল নষ্ট করি।

এরপর ওকে সব সময় বোঝাতে থাকি, এভাবে আর বেশি দিন চলা যায় না। ফলে গত ডিসেম্বরে আমরা লুকিয়ে বিয়ে করি। আমাদের বিয়ের ব্যাপার আমাদের দুই পরিবারের কেউই এখনো জানে না। আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাদের আরো বেশি পাপ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু উজ্জ্বলের মতো নির্দোষ, নিরীহ ছেলেকে প্রতারণার জন্য খুব অপরাধ বোধে ভুগি।

পাঠকবৃন্দ, আপনাদের সকলের কাছে দোয়া চাই, আমাদের সামনের দাম্পত্য জীবনে চলার পথে যতোই ঝড় উঠুক, সেই ঝড় যেন মোকাবেলা করতে পারি। ও জানে কি জানি না, তবে এখনো ওকে আমার জীবনের থেকে বেশি ভালোবাসি।

এখন আমরা দুজন দুজনের সবচেয়ে কাছের। আমাদের বয়সের কারণে ওর মনে কোনো সমস্যা আছে কি সেটা আমাকে কখনো ও বুঝতে দেয়নি। কিন্তু আমার আফসোস, আল্লাহ কেন আমাকে আরো ছয় বছর পর এই পৃথিবীতে পাঠালো না।

এখন পড়ালেখা শেষ করে একটি চাকরি করছি। আর ও মাত্র অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে। ওর পড়ালেখা শেষ হলেই আমরা সংসার শুরু করবো।

নাম ও পূর্ণ ঠিকানা বিহীন
মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

ম্যাডামের প্রেম

রমজান মাস, ইফতার পার্টিতে পার্টটাইম কাজে এসেছি। লেবানিজ পরিবার। বাসার গৃহিণী অত্যন্ত ব্যস্ত। আমাকে বললেন, প্লিজ, তাবোলা সালাদের জন্যে এগুলো রেডি করো। লেটুস পাতা, পাচলি পাতা, টমাটো, পেয়াজ, বরগোল, অলিভ অয়েল নিয়ে প্রস্তুত করছি।

হ্যালো, কেমন আছো?

পিছন ফিরে দেখি এক লাবণ্যময়ী অপরূপা। আমাকে বললেন, আমি এগুলো তৈরি করছি, তুমি একটু বিশ্রাম নাও।

তাকে ধন্যবাদ দিলাম। সন্ধ্যার পর থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত আমাকে খুব ব্যস্ত থাকতে হবে।

লেবানিজ মহিলারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে ভীষণ সতর্ক। এরা অত্যন্ত শৌখিন এবং বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত। মহিলাদের মধ্যে প্রায় সময় একটা প্রতিযোগিতা ভাব দেখা যায়। কারো বাসায় শৌখিন নতুন কিছু দেখলে অন্যরা এর চেয়ে সুন্দর কিনবে। সংসারে পুরুষের চেয়ে মহিলার কর্তৃত্ব বেশি। ইফতার পার্টিতে অতি নিকটজন ছাড়া কেউ আগে আসবে না। ইফতার শুরু হওয়ার সময় অতিথিরা হাজির।

রাতে মেয়েদের হুক্কা খাওয়া আমার কাছে অবাক লাগে। আমাদের দেশের নারিকেলের হুক্কা নয়, একেবারে বাদশাহী আলিশান হুক্কা।

কাজ করি একটা কেটারিং কম্পানিতে। আমেরিকান কম্পানি, ম্যাকডোনাল্ড ডগলাস–এর অধীনে। আমার শুক্রবার ছুটি বিধায় বৃহস্পতিবার রাতে পার্টিতে সমস্যা হয় না।

এক বিকেলে মেসেজ পেলাম, আমি যেন ওই অপরূপার সঙ্গে দেখা করি।

যেকোনো পার্টিতে কাজ করার জন্য বেশ কিছু লেবানিজ পরিবারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে।

যথাসময়ে ম্যাডামের কম্পাউন্ডে গিয়ে হাজির। গেটে সিকিউরিটিকে পরিচয় দিয়ে ভেতরে গেলাম। হাই ফাই কম্পাউন্ড।

কলিংবেল টিপতেই ম্যাডাম দরজা খুলে ইংরেজি ও আরবিতে অনেক বিশেষণ দিয়ে ভেতরে আসতে বললেন।

চমৎকার সাজানো সিটিংরুম। সব কিছুতেই আধুনিকতার ছাপ।

বছর দুয়েকের এক বাচ্চাকে কোলে নিয়ে এক ভুড়িওয়ালা আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন।
ওনাকে দেখে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। এমন লাবণ্যবতীর এই পেটকো স্বামী?
বাসায় কাজে গেলে বাচ্চাটা আমার কাছে থাকে। বড় ভালো লাগে।
কিছুদিন পর লক্ষ্য করলাম ওনারা স্বামী-স্ত্রী এই ভালো, এই মন্দ। কখনো ঝগড়া এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, আমার খুব লজ্জা লাগে।
ভদ্রলোক জার্মান কম্পানির বড় কর্মকর্তা। প্রতি মাসে তাকে দেশের বাইরে যেতে হয়। প্রায় লেবানিজ পুরুষেরা মদ, জুয়া এবং পর নারীতে আসক্ত। ভদ্রলোকও এর ব্যতিক্রম নন। এ নিয়ে দম্পতির মধ্যে মনোমালিন্য।
ভদ্রলোকের সঙ্গে মাঝে মধ্যে আমার অনেক কথা হয়।
তিনি একদিন আমাকে বললেন, তুমি তো অবিবাহিত, তাই না? শোনো, মেয়েদের মন বোঝা বড় কঠিন। তোমার ম্যাডাম আমাকে সন্দেহ করে। আমি নাকি দেশের বাইরে গিয়ে অন্য মেয়ে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করি।
একদিন ম্যাডামের মুখের দিকে চেয়ে দেখি, করুণ মুখ। কোনো সাজ-সজ্জা নেই। বুঝলাম বড় ঝগড়া হয়েছে। এটা আর নতুন কি?
ম্যাডামও অনেক সময়ে দুঃখের কথা আমাকে বলতেন। রাতে ঝগড়ার এক পর্যায়ে তার স্বামী আরেকটি বিয়ে করবে বলে হুমকি দিয়েছে। আচ্ছা, তুমি বলো, আমি কি অসুন্দরী, নাকি বুড়ি হয়ে গেছি? ম্যাডামের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে।
ও যখন গভীর রাতে আমার ঠোটে ওর ঠোট রাখে, মনে হয় অন্য মেয়েদের লিপস্টিক আমার ঠোটে লেগে আছে। আমার ঘৃণা লাগে। আচ্ছা, পুরুষেরা কি এ রকমই?
আমি শুধু তার করুণ মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।
ম্যাডাম একটু সময় নিয়ে বললেন, প্লিজ, এক কাপ টার্কিশ কফি দাও।
আজ রাতে নিউ ইয়ারের পার্টি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। প্রচুর বাতাস, কনকনে শীত। এ দেশে গরমের দিনে বৃষ্টি হবে না, ঝড়-বৃষ্টি হবে শীতের দিনে। সুইমিং পুলের পাশে বিরাট পার্টি রুম।
খাবার এসেছে আবু নাওয়াজ (লেবানিজ) রেস্টুরেন্ট থেকে, সঙ্গে ফিলিপিনো ওয়েটার। শ্রী লংকার এক হাউসমেড এবং আমি এদিক-ওদিক দেখছি। লাউড স্পিকারে আরবি গান বাজছে। লেবানিজ মেয়েরা কোমর দুলিয়ে হেলে-দুলে নাচছে।
শ্যাম্পেইন, আপেল জুস, লাল-শাদা গ্রেপ জুস, অরেঞ্জ জুস পরিবেশন করা হচ্ছে। সঙ্গে বাদাম, চিপস, ক্র্যাকার্স। ওয়াইন, হুইস্কি, ভদকা, জিন এগুলো পার্টির বাইরে, নিজের ঘরে। কেউ কেউ ঘরে যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে।
ম্যাডামের স্বামী দুবাই গেছেন কম্পানির কাজে। ম্যাডাম আজ সুন্দর করে সেজেছেন। তাকে খুব সুন্দরী লাগছে বলায় আমার গাল ধরে হালকা টান দিলেন।
শিহরিত হলাম।
অনেক রাত হয়েছে। বাচ্চার চোখে ঘুম। ওকে বাসায় এনে বিছানায় শুইয়ে দিলাম।

সিটিংরুমে বসে টিভি দেখছি আর ভাবছি কিভাবে নিজের কম্পাউন্ডে যাবো! এতো রাতে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে লিমোজিন পাওয়া যাবে না।

ম্যাডাম ঘরে ঢুকে বাচ্চার কথা জিজ্ঞাসা করে বেডরুমে চলে গেলেন।

ক্লান্ত শরীর টিভি অফ করে সোফায় কাত হয়ে আছি।

ম্যাডাম তার রুমে ডাকলেন।

রুমে গিয়ে দেখি তার হাতে গ্লাস, পাশে ব্ল্যাক লেবেলের বোতল। শরীরে আকাশী রঙের নাইটি। এ পোশাকে আগে কখনো দেখিনি। আমার ক্লান্তি দূর হয়ে গেল।

ম্যাডাম হাতের গ্লাস টেবিলে রেখে আমার দিকে অপলক চেয়ে রইলেন। এক সময় ম্যাডাম আমার মুখের কাছে তার মুখ আনলেন। মদের গন্ধ বের হচ্ছে। আমার ঠোটে ঠোট রেখে বললেন, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনি আমাকে নিয়ে বিছানায় গেলেন। মনে হচ্ছে তিনি তার স্বামীর ওপর প্রতিহিংসায় জ্বলছেন।

ম্যাডাম আমাকে সব উজাড় করে দিলেন।

এরপর থেকে প্রায়ই তিনি আমাকে নিয়ে সাগরের অতল তলে হারিয়ে যেতেন।

তাকে দেখলেই আমার নেশা ধরে যেতো।

হঠাৎ একদিন ম্যাডাম বললেন, আমরা দুবাই চলে যাচ্ছি।

এক মাস পরে ভালোবাসা দিবস।

যাবার দিন একটি ভ্যালেনটাইনস ডে-এর কার্ড আমাকে দিয়ে বললেন, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি।

তারপর চাকরির মেয়াদ শেষ করে আমিও দেশে চলে গেলাম।

শুধু সউদি আরবে না, মধ্যপ্রাচ্যের হাতেগোনা শপিং মলের মধ্যে আল খোবার, আল রশিদ মল-ও একটি অন্যতম। আল রশিদ মলের তিন তলায় রিৎজ কাফের পাশে দাড়িয়ে আছি এক বন্ধুর অপেক্ষায়। অপ্রত্যাশিতভাবে পাচ বছর পর আবার সেই ম্যাডামের সঙ্গে দেখা। আমি তো অবাক!

আমাকে খুব ভালোভাবে দেখছেন। কারণ আমি এখন আর সেই আগের মতো নেই। বললেন, বিয়ে করেছো?

হ্যা বললাম।

তোমাকে বেশ হ্যান্ডসাম লাগছে। মিষ্টি হেসে বললেন।

তোমাকেও খুব সুন্দর লাগছে!

ম্যাডাম হেসে বললেন, ধূর, আমি মোটা হয়ে গেছি।

বস কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করায় বললেন, আছে আর কি?

অনেক কথা হলো।

ম্যাডাম বললেন, কাল চলে যাচ্ছি। মাত্র চার দিনের জন্য এসেছিলাম।

আমার মন খারাপ হয়ে গেল।

কি কাজ করো এখন?

বললাম, ব্যবসা করি। আমার কার্ড তাকে দিলাম।

ভীষণ খুশি হলেন। দূর থেকে এক মহিলা ম্যাডামকে ডাকছেন।

ম্যাডাম আমার খুব কাছে এসে বললেন, আজও তোমাকে ভালোবাসি এবং মিস করি। পরে ফোনে কথা হবে বলে চলে গেলেন।

আমি তার চলে যাবার পথের দিকে আনমনে চেয়ে রইলাম।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

ফারিয়া

– উম্মে সালমা

প্রেম–ভালোবাসা যে এতো গভীর হতে পারে ফারিয়াকে না দেখলে হয়তো বা বিশ্বাস করতে পারতাম না। ফারিয়া আমার স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে তিনকালেরই বান্ধবী।

একদিন আমি *যায়যায়দিন*–এ খুব সুন্দর একটি কাহিনী পড়লাম এবং তাকে পড়তে বললাম।

যখন ফারিয়া এই কাহিনী পড়লো তখন সে কান্না শুরু করে দিল। তাকে বললাম, এতো আবেগ প্রবণ হলে চলে, এতে কান্নার কি আছে? লেখক নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে হয়তো বা কাহিনীটি তৈরি করেছেন, এতে দুঃখ পাওয়ার কিংবা কান্না করার মতো কিছু তো দেখছি না।

আমার সঙ্গে তখন ফারিয়া কোনো প্রকার তর্কে না জড়িয়ে বাসায় চলে গেল।

বলে রাখা ভালো, সেই লেখক বাস করেন আমেরিকাতে এবং তার গল্পের শেষে সে তার ইমেইল অ্যাডড্রেস লিখেছিল।

ফারিয়া ওখান থেকে ঠিকানা যোগাড় করে সেদিনই তাকে মেইল পাঠালো। রাতে আমাকে ফোন করে বললো, জানিস, আমি তাকে মেইল পাঠিয়েছি।

বললাম, ভালো কথা। উত্তরের জন্য অপেক্ষা কর।

বেশি দিন অপেক্ষা করতে হলো না তাকে। পরদিনই তাকে লেখক মেইল পাঠালো।

এভাবে এক বছর কেটে গেল।

ফারিয়া সব সময় আমাকে বাধ্য করতো তাদের দুজনের মেইল পড়তে। মেইল পড়ার মাধ্যমে বুঝতে পারলাম কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। অবাক হলাম এই ভেবে, এতোদিন ধরে তারা একজন আরেকজনকে মেইল পাঠাচ্ছে, কেউ কারো ছবি পর্যন্ত দেখলো না। অথচ একে অপরকে ভালোবাসে। ফারিয়াকে বললাম, আচ্ছা শোন, তুই যে ওই লেখককে ভালোবাসিস বা সেও যে তোকে ভালোবাসে। যখন তোদের দুজনের প্রথম দেখা হবে, তোর যদি লেখককে পছন্দ না হয় বা লেখক যদি তোকে পছন্দ না করে তখন কি করবি? পারবি ধাক্কা সামলাতে?

ফারিয়া শুধু বললো, দেখ, সে বিশ্রী হলেও তা মেনে নেবো। আমি চেহারা দেখে কাউকে পছন্দ করতে চাই না। আমি চাই সুন্দর মনের মানুষ। নিঃসন্দেহে লেখক একজন সুন্দর মনের মানুষ।

এক বছর পর ফারিয়ার মাধ্যমে জানাতে পারলাম মাহমুদ আসছে। হ্যা, ওই লেখকের নাম ছিল মাহমুদ।

ফারিয়া আমাকে ফোন করে বললো, তুই ১৩ মার্চ আমার বাসায় অবশ্যই আসবি।

বললাম, খবর কি? এতো জরুরি তলব।

পরে জানতে পারলাম মাহমুদ আসছে ১৩ মার্চ এবং ফারিয়া এয়ারপোর্টে যাচ্ছে। আমাকে তার সঙ্গে যেতে হবে।

বাধ্য হয়ে গেলাম ফারিয়ার সঙ্গে। ফারিয়াকে বললাম, জীবনেও যার ছবি দেখলাম না, এতো লোকের ভিড়ে তাকে কিভাবে খুজে বের করবো?

ফারিয়া তখন বললো, আজ দেশে ফেরার সময় পাঞ্জাবি পরে আসবে।

তাই তো বলি, হিরোইনকে বকাঝকা দিয়েও কখনো কোনো অনুষ্ঠানে শাড়ি পরিয়ে নিয়ে যেতে পারলাম না। আর আজ নিজের আগ্রহে শাড়ি পরে চলে এসেছে এয়ারপোর্টে!

যাক, মাহমুদকে খুজে পেতে আমাদের খুব বেশি কষ্ট হলো না। দেখা পেলাম আবার মাহমুদের বাবা মায়ের। মাহমুদ শ্যামলা, লম্বা, স্মার্ট এবং যথেষ্ট কিউট ছিল।

সে বিদেশে একটি কম্পানির ফিনান্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে কাজ করতো।

মাহমুদের বাবা ও মা দুজনেই ফারিয়াকে পছন্দ করলো।

মাহমুদ দেশে ফেরার পনেরো দিন পরেই ফারিয়ার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়ে যায়।

এরই মধ্যে ঘটনা মোড় নেয় অন্যদিকে। মাহমুদ গাড়ি দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং অন্ধ হয়ে যায়। বিয়েটা স্বাভাবিকভাবেই ভেঙে যায়। কারণ ফারিয়াকে মাহমুদ বিয়ে করতে চায় না। তার এই জীবনে কাউকে সে কষ্টের ভাগীদার করতে চায় না।

এদিকে ফারিয়াও নাছোড়বান্দা। ফারিয়া বললো, সে অন্ধ হোক, তবুও তাকে বিয়ে করবো।

একদিন ফারিয়ার সঙ্গে মাহমুদকে দেখতে হাসপাতালে গেলাম। তাদের ভালোবাসার গভীরতা দেখে ভড়কে গেলাম। তাদের দুজনের কান্না দেখে আমার চোখে পানি এসে গেল।

মাহমুদকে ফারিয়া বললো, দেখো, যদি আমাদের বিয়ে হয়ে যেতো এবং বিয়ের পরে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতো তাহলে কি তোমাকে মেনে নিতাম না, তোমার সেবা করতাম না।

অবাক হলাম ফারিয়ার যুক্তি দেখে। ফারিয়ার যুক্তির কাছে মাহমুদকে হেরে যেতে দেখে। আজও মনে পড়ে আমার, মাহমুদকে জড়িয়ে ধরে ফারিয়া কি যে কান্না! কান্না করতে করতে বললো, মাহমুদ, ভালোবাসি আজও তোমায়।

বাক্যটি এতো বেশি ভালো লাগলো যে, আজও এটি আমার কানে বাজে।

হয়তো ফারিয়ার সেই ভালোবাসার পরশে আজ মাহমুদ সম্পূর্ণ সুস্থ। আমেরিকায় গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে মাহমুদ আধারের জীবন থেকে মুক্ত হয়ে আলোর জীবনে ফিরে আসে। আজ ফারিয়া ও মাহমুদ আমার থেকে অনেক দূরে সেই সূদুর আমেরিকায়। ফারিয়া ও মাহমুদ, সুখে থাকো এ প্রত্যাশাই করি।

পূর্ণ ঠিকানা বিহীন, আইআইইউসি থেকে